KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৪৪ সন্তোষ দত্ত এ্যাভিনিউ, কল-৩৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীতা চক্রবর্তী
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৮/২ ৪৮/৪ ৪৮/৫ ৪৮/৬	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৪ ॥ Jun 1987 শ্রাবণ ১৩৯৪ ॥ Aug 1987 ভাদ্র ১৩৯৪ ॥ Sep 1987 আশ্বিন ১৩৯৪ ॥ Oct 1987 Condition : Brittle Good
Editor : আবদুল হক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

অকটোবর ১৯৮৭

বাঙলা কবিতা বিষয়ে ৪৯ বছর আগে লেখা সদ্যঃপ্রয়াত সমর সেনের একটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ—যার প্রাসঙ্গিকতা আজো অম্লান।

অশ্রুকুমার সিকদার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্মশতবর্ষে তাঁর মূল্যায়ন করেছেন রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্যে আধুনিক ভাবনার অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে।

ত্রিপুরায় বাঙালি-উপজাতি সংঘাতের আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন সমরেন্দ্র চৌধুরী।

শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিকের অসংগতি নিয়ে সনাতন মিত্রের কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা।

ইউরোপের সাম্যবাদী আন্দোলনে যে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে তার অন্যতম তাত্ত্বিক-বুনিয়াদ-রচয়িতা হিসাবে গ্রাম্‌স্‌চির গুরুত্ব সমধিক। এই মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের ভিন্নধর্মী বিপ্লবচিন্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডঃ সুনীলকুমার সেন।

কমলকুমার মজুমদার ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যের বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিক রীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লেখা মোহিতলাল মজুমদারের ষোলোটি অপ্রকাশিত চিঠি।

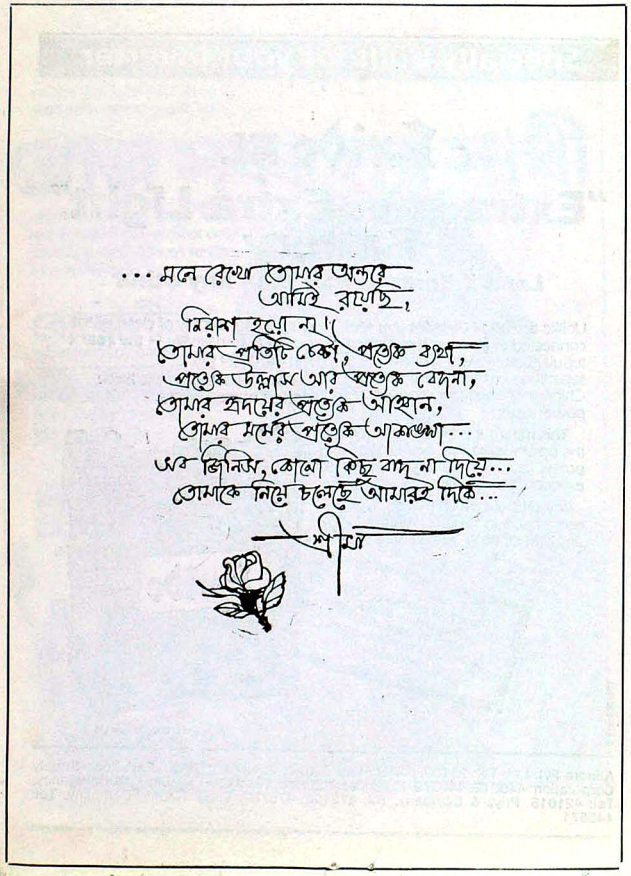

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৬
অকটোবর ১৯৮৭
আশ্বিন ১৩৯৪

প্রসঙ্গ গ্রাম্‌সূচি সুনীল সেন ৪৭৭
বাংলা কবিতা সমর সেন ৪৮৮
যতীন্দ্রনাথ : আধুনিকতার সূচনা অশ্রুকুমার সিকদার ৫০৫
ত্রিপুরার উপজাতিসমস্যা সমরেন্দ্র চৌধুরী ৫২০
ম্যাদ্রিগাল মধুভাষ মিত্র ৪৮৪
বৃত্তের বাহিরে ডেকো মৃণাল চক্রবর্তী ৪৮৫
ভাষা আনন্দ ঘোষ হাজরা ৪৮৬
আত্মদীপ অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য ৪৮৭
তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৪৯১
অন্নমণি বেওয়া দুর্গা বসু ৫১১
গ্রন্থসমালোচনা ৫২৭
হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিলকুমার নন্দী, সুব্রত সরকার,
বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৫৪৪
ধূপ, রজনীগন্ধা ও বাঙালির সংস্কৃতি সনাতন মিত্র
বাংলাদেশ থেকে ৫৪৮
নেতৃত্বের সংকট আশরাফ শামীম
পত্রাবলী ৫৫৩
মোহিতলাল ও বিভূতিভূষণ শঙ্কর ভট্টাচার্য
মতামত ৫৬২
নাটক ৫৬৫
দুটি নাটক : প্রাসঙ্গিক ভাবনা অভিজিৎ করগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

Calcutta Steel Company Limited

"Steel House"

2, Hemanta Basu Sarani, Calcutta-700 001

Manufacturers of :

STEEL BARS □ RODS □ WIRE RODS □ COLD TWISTED DEFORMED BARS AND FLATS.

প্রসঙ্গ গ্রামসচি

সুনীল সেন

লেনিনের পরে সৃজনশীল মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা গ্রামসচি। দু দশক আগেও ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে তিনি প্রায় অজ্ঞাত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর চিন্তা সম্বন্ধে চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন সুশোভন সরকার। কিন্তু এই প্রবন্ধ তেমন আলোচিত হয় নি। বিগত দশকে অনেক মার্কসবাদীর লেখায় পুরোভাগে এসেছেন গ্রামসচি। সম্ভবত এর পিছনে আছে ইউরোকমিউনিজম এবং বিশেষ করে ইটালির কমিউনিসট পার্টির অভিনব কর্মসূচী, যার মধ্যে রুশ মডেলের প্রভাব ক্ষীয়মাণ। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনী এবং রচনা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ইটালিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রামসচি ইনসটিট্যুট। স্বভাবতই গ্রামসচির মূল্যায়ন এখন অপেক্ষাকৃত সহজ।

১

সার্ডিনিয়ার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯১ সালের ২২ জানুয়ারি অ্যানটোনিও গ্রামসচির জন্ম। প্রতিভাবান এই ছাত্র বৃত্তি পেয়ে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। তুরিনে তাঁর জীবনের প্রথম দিকপরিবর্তনের শুরু। শ্রমিক-আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কেন্দ্র তুরিন, গ্রামসচির ভাষায় "ইটালির পেট্রোগ্রাড"। সমাজতন্ত্রী মহলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ সমাজতন্ত্রীদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তরুণ গ্রামসচি লেনিনবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯২০-২১ পর্বে উত্তর ইটালি শ্রমিক-ধর্মঘটে উত্তাল হলেও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রমিক-আন্দোলনে ভাঁটার টান যে শুরু হয়ে গিয়েছে, কমিউনিসটরা তা ঠিক বুঝতে পারেন নি। ১৯২২-এর অকটোবরে একদা সমাজতন্ত্রী দলের "বামপন্থী" নেতা মুসোলিনির নেতৃত্বে ফাসিসট দল ক্ষমতা দখল করে। ইটালিতেই প্রথম ফাসিসটতন্ত্র বিজয়ী হয়; পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে ফ্রানসে আর জারমানিতে তখনও সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিসট দল শক্তিশালী।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইটালির কমিউনিসট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন গ্রামসচি। নেতৃত্ব ছিল উগ্র বামপন্থীদের হাতে, যাদের নেতা পার্টির সম্পাদক বোর্ডিগা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, গ্রামসচিও ছিলেন বামপন্থীদের দলে। কমিউনিসট আন্তর্জাতিকের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই বামপন্থী নেতৃত্ব তাঁদের সংকীর্ণতাবাদী নীতিতে অবিচল থাকেন। ১৯২২ সালে পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে গ্রামসচি মসকোতে আসেন এবং কমিউনিসট

আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত হন। মসকোতে তাঁর সঙ্গে জুলিয়ার পরিচয় এবং বিয়ে হয়। এই একটি বছর আনন্দে-শান্তিতে কাটে তাঁর জীবন। তাঁদের দুটি সন্তান হয়; ছোটোটিকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয় নি। জুলিয়ার বোন তাতিয়ানা ছিলেন তাঁর বন্ধু।

মসকো থেকে ভিয়েনার পথে দেশে ফিরে ১৯২৪ সালে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্ভবত এর পিছনে ছিল মসকোর হস্তক্ষেপ। পার্টির মুখপত্র "উনিতা" প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর আর দক্ষিণ ইটালির ঐক্যের আদর্শ পত্রিকার নামকরণে প্রতিফলিত। দক্ষিণ ইটালির সমস্যা বারে-বারে গ্রামসচির লেখায় এসেছে। কৃষিপ্রধান এবং অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চল দক্ষিণ ইটালিকে বাদ দিয়ে উত্তর ইটালির শ্রমিকশ্রেণীর চেষ্টায় ইটালির রূপান্তরের পরিকল্পনা অবাস্তব; তার ব্যর্থতা যে অনিবার্য সে বিষয়ে গ্রামসচির মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। শ্রমিক-কৃষক-মৈত্রী ছিল তাঁর কাম্য। তিনি মাত্র দু বছর কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ফাসিসটদের বীভৎস দমননীতি অবিরাম চলেছিল, যার প্রধান লক্ষ্য সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিসট দল। ১৯২৬ সালে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সুইটজারল্যানডের পথে তাঁর দেশত্যাগের ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু তিনি রাজী হন নি। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ক্যাপটেনের সরে পড়া উচিত নয়—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। আদালতে সরকারি পক্ষের উকিল বলেছিলেন, বিশ বছরের জন্য এই মাথা অচল রাখতেই হবে। কিন্তু বিশ বছর তিনি বাঁচেন নি। ১৯৩৭ সালে তাঁরে মৃত্যু হয়। আট বছর পরে ইটালিতে এল বসন্ত। তখন মিলানের রাস্তায় ল্যামপপোসটে ঝুলছিল মুসোলিনির মৃতদেহ। সেদিন জনতা বিজয়-উৎসবে মত্ত।

মুসোলিনির কারাগারে তাঁর কেটেছিল এগারো বৎসর। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর শরীর দুর্বল। কারাগারে অবিরাম নির্যাতনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। দিনের পর দিন অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা এবং রক্তবমি। কিন্তু তিনি লেখা বন্ধ করেন নি। মাসের পর মাস তিনি লিখে গেছেন ইতিহাস, দর্শন এবং বিপ্লবী কর্মসূচী প্রসঙ্গে। শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে এসে তাতিয়ানা তাঁর ঘর থেকে নিমেষে সরিয়ে ফেলেন যে পাণ্ডুলিপি, তাই অধুনা খ্যাত Prison Notebooks। জেল থেকে জুলিয়া, তাতিয়ানা, মা এবং বোনদের কাছে তিনি চিঠি লিখতেন। তাঁর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং আকর্ষণ প্রতিভাত। Prison Notebooks এবং তাঁর পত্রাবলী মার্কসবাদী আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সৃজনশীল মার্কসবাদের দৃষ্টান্ত তাঁর লেখা।

২

গ্রামসচির চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় সেযুগে লেনিন ছাড়া কৃষিসমস্যাকে আর কোনো মার্কসবাদী এত গুরুত্ব দেন নি। দক্ষিণ ইটালিতে তিনি দেখেছেন প্রাক-ধনতান্ত্রিক কৃষি। বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত মেটায়ার প্রথা (metayer; যার সঙ্গে বঙ্গের বর্গাপ্রথার পারিবারিক সাদৃশ্য প্রতিভাত)। এই প্রথায় কৃষক ফসলে খাজনা দেয়, যার পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের প্রায় অর্ধেক, কখনো দুই-তৃতীয়াংশ। অপর প্রান্তে বড়ো-বড়ো ভূস্বামী। আর-একটি বর্গ কৃষি-শ্রমিক। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের মতো কৃষি-শ্রমিক ধনতান্ত্রিক কৃষির অঙ্গ নয়, তাকে গরিব কৃষক বলাই ভালো। গ্রামের মাতব্বর "গ্রাম্য বুর্জোয়া শ্রেণী", কৃষকের সঙ্গে এই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। কৃষকের চরম দারিদ্র্য এই শ্রেণীর উত্থানের ভিত্তি, কৃষকদের মধ্যে মৃদু প্রতিবাদ এদের কাছে অসহ্য।

ইটালির জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা

ফ্রানসের জ্যাকোবিনদের মতো ম্যাটসিনি-গারিবল্ডির দল (তাঁর ভাষায় "অ্যাকশন পার্টি") কৃষকদের সমর্থন এবং আন্দোলন বিকশিত করতে পারে নি। ফ্রানসে দেখা গেছে শহরের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পাশাপাশি চলেছে গ্রামদেশে কৃষক-বিদ্রোহ। কৃষকদের জমি আর "ম্যানর" দখল। সার্ফ-প্রথা ধ্বংস হল, কৃষক জমি পেল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্যন্ত বিপ্লবের এই অবদান অক্ষুণ্ণ ছিল। ফরাসি বিপ্লব জাতীয় বিপ্লব। জাতির সমস্ত স্তরের সমর্থন ছিল বিপ্লবের পিছনে। ইটালিতে অ্যাকশন পার্টির পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন কৃষকের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত জয় হল কাভুরের। তাঁর রাজনীতি এবং দর্শন নরমপন্থী। ইটালির জাতীয় আন্দোলনের এই প্রক্রিয়ার পরিণতি ফ্যাসিবাদ। অ্যাকশন পার্টির ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত শ্রেণী এবং গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী মোরচা গঠন করে। অ্যাকশন পার্টি যদি কৃষকদের ন্যূনতম দাবি সমর্থন করে অগ্রসর হতেন তাহলে ইতিহাস অন্য রূপ নিত। কৃষক-সমর্থন ছাড়া বুর্জোয়া বিপ্লব ভঙ্গুর হয়।

মহান ফরাসি বিপ্লবের সময় দেখা গেছে কৃষকের জঙ্গী আন্দোলন বিকশিত হলে বুদ্ধিজীবী ভীত হন। আবার বুদ্ধিজীবী যদি কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহলে ব্যাপক জনতার সমর্থন পাওয়া যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষকদের নিয়ে শক্ত সংগঠন তৈরি করা দুঃসাধ্য। তাই প্রথমে গ্রামের বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন শুরু করা শ্রেয়। কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিথিল সংগঠন গড়ে তুলতে পারলেও বিপ্লবের পক্ষে তা সহায়ক হয়।

কৃষকের জীবনধারা এবং ধ্যানধারণা গভীরভাবে বুঝতে হলে বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুধাবন করতে হবে। বুদ্ধিজীবীর আন্দোলনের সঙ্গে কৃষকদের সমস্ত আলোড়ন যুক্ত থাকে অন্তত একটা পর্ব পর্যন্ত। মনে হয় বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনকে একটি স্রোতে মিলিত করার দিকে গ্রামসচির আগ্রহ ছিল। তাই তিনি জ্যাকোবিন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। জ্যাকোবিন দলের শক্তি আর সাফল্যের উৎস তাদের কৃষিসংক্রান্ত নীতি। ফ্রানসের গ্রামদেশে প্রতিবিপ্লব চূর্ণ করতে এই নীতি ছিল সহায়ক। শেষ পর্যন্ত নরমপন্থীরা যে পরাজিত হয়েছিল তা দৈবাৎ ঘটনা নয়। বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব মেনে নিল ফ্রানসের গ্রাম। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামের মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার ফলে সুসংবদ্ধ আধুনিক ফরাসি জাতির সৃষ্টি হল। জ্যাকবিন ঐতিহ্য গ্রামসচির কাছে অশেষ মূল্যবান। ফ্রানসের ইতিহাস তিনি তন্ন-তন্ন করে পড়েছিলেন। গ্রামসচি একাধারে দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ।

৩

বুদ্ধিজীবীর মানসিকতা, সামাজিক আন্দোলনে তার ভূমিকা, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক গ্রামসচির লেখায় উদ্ভাসিত। রেনেসাঁসের দেশে তাঁর জন্ম। তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি মানুষ। এখানেই তোগলিয়াত্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, যিনি পরবর্তী জীবনে ইটালির কমিউনিসট দলের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর আর-একজন বন্ধু স্রাফা (Sraffa), বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। Ordine Nuovo এবং Unita পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

Ordine Nuovo প্রধানত সাংস্কৃতিক পত্রিকা, যার লক্ষ্য মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে দেখা গেছে যুক্তিবাদী চিন্তা। শ্রমিকশ্রেণীর উচিত তার নিজের জ্ঞান উন্নত করা। শ্রমিক এবং কৃষকদের তাদের নিজেদের স্বার্থে এই দুনিয়া সম্বন্ধে জানা দরকার। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় শ্রমিকশ্রেণীর

মধ্য থেকে একদল বুদ্ধিজীবীর বিকাশ ছিল তাঁর কাম্য।

বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দুটি বর্গ—"organic" এবং "traditional"। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে গড়ে ওঠে টেকনিসিয়ান এবং রাজনীতিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী। ঐতিহ্যগত ("traditional") বুদ্ধিজীবীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক, কেরানি, পুরোহিত, আইনজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি। কৃষকদের তুলনায় এই বর্গের জীবনযাত্রা উন্নত। কৃষকশ্রেণী এই বর্গকে শ্রদ্ধাও করে, আবার ঘৃণাও করে। এই বর্গ থেকেই সাধারণত রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। যে বিষয়টি বোঝা দরকার তা হল, গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবীর পিছনেই কৃষক-সমাজ অনেক সময় সমবেত হয়। কৃষক ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবীর অনুরাগী, অনেক সময় তার লেজুড়।

"সব মানুষই বুদ্ধিজীবী", যদিও সমাজে সব মানুষই বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি অনুসরণ করে না। নতুন বুদ্ধিজীবী গড়তে হলে সচেতন চেষ্টা চালাতে হবে। আধুনিক বিশ্বে শ্রমিকের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারিগরিশিক্ষা, তাই কারিগরি শিক্ষার প্রসার দিয়ে শুরু করতে হবে নতুন বুদ্ধিজীবী তৈরির কাজ। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প। তেমন বুদ্ধিজীবীর জন্য উন্নতমানের বিদ্যালয় এবং ইনস্টিট্যুট গড়ে তুলতে হবে। ইটালিতে দেখা গেছে, শিল্পোন্নত উত্তর অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে টেকনিসিয়ান, আর দক্ষিণ ইটালিতে বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। গ্রাম্য বুরজোয়া রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক বাহিনীর স্তম্ভ। গ্রাম্য বুরজোয়ার সঙ্গে ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবীর যোগাযোগ।

সামরিক বিজ্ঞানে দুর্বলতম অংশকে সরাসরি আঘাত করার কৌশল গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এই কৌশল অগ্রাহ্য। দুর্বলদের পরাজিত করা খুব কঠিন নয়। তার বিশেষ গুরুত্বও নেই। শত্রুশিবিরের সবচেয়ে শক্তিমানের বিরুদ্ধে লড়াই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই বড়ো কথা। যে-কোনো সমাজে সাধারণ ("mediocre") বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাদের লেখা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর্যায়ে পড়ে না। বৈজ্ঞানিক কাজ অনন্য।

সাংবাদিক এবং সমাজবিজ্ঞানী এক বস্তু নয়।

মসকোয় প্রকাশিত বুখারিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রামসচি বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব এবং সতর্কতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বুখারিনের লেখা "vulgar materialism"। নিছক বস্তুবাদ দিয়ে ইতিহাসের ধারা বোঝা দুঃসাধ্য। বুখারিন ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বুঝতেন না। তাঁর মতে নতুন সত্যের সন্ধান বিজ্ঞানের লক্ষ্য। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হবেন যুক্তিবাদী, নতুন-নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার বিশ্লেষণ বুদ্ধিজীবীর কাজ। ডায়ালেকটিক তাঁকে অনুধাবন করতে হবে। গ্রামসচির মার্কসবাদ মূলত বিশ্লেষণধর্মী।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগে এবং পরে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা খাটো করে দেখা ভুল। নতুন সত্যের সন্ধানে নিরন্তর গবেষণার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীর। বুদ্ধিজীবীর "স্বাধীন তৎপরতা" বিনা সত্যের সন্ধান দুঃসাধ্য। বৈজ্ঞানিক আলোচনার লক্ষ্য সত্যের সন্ধান এবং বিজ্ঞানের বিকাশ। তিনিই সবচেয়ে 'উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি যিনি মনে করেন যে তাঁর বিরুদ্ধবাদীও হয়তো কিছু সত্য বলছেন।' বিরুদ্ধবাদীর মতামত অনেক সময় সত্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। নতুন সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন উন্নত ভাবাদর্শ। উন্নত চিন্তা। ক্ষমতা দখলের পরে শ্রমিকশ্রেণীকে তৈরি করতে হবে 'এক নতুন নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা।' এই কাজে বুদ্ধিজীবী অপরিহার্য। বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গবেষণার স্বাধীনতা গ্রামসচির লেখায় যে গুরুত্ব পেয়েছে সাম্যবাদী মহলে তা এখনো বিরল। বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা রাষ্ট্র কি আদৌ নিয়ন্ত্রণ করবে? বিষয়টি সাম্যবাদী দেশে অধুনা আলোচিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে সুখের কথা।

৪

বিপ্লবের পথ কী? সব দেশে, সব ঐতিহাসিক অবস্থায় বিপ্লবের পথ কি এক এবং অভিন্ন? লেনিনের মত স্পষ্ট। ক্ষমতা-দখলের পথ সশস্ত্র বিপ্লব, যার নেতৃত্ব দেবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কমিউনিসট পার্টি। এপ্রিল থিসেসে তিনি এই পথের নির্দেশ দেন; বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাবের রচয়িতা এবং উত্থাপক লেনিন স্বয়ং। বিপ্লবের অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব পার্টির প্রাপ্য।

গ্রামসচি বলেন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ দুই রকম: war of movement এবং war of position (বা passive revolution)। প্রথম পথ লেনিনবাদী পথ, অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত করার পথ। ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মার্চ পর্যন্ত এই পথ ইউরোপে অনুসৃত হয়েছিল; বিপ্লবী আন্দোলনে তখন জোয়ার। ১৯২২-এ ইটালিতে ফাসিসটদের বিজয় থেকে ইউরোপের ইতিহাসে দিক-পরিবর্তনের শুরু। ১৯২৯-৩৩ পর্বে দেখা দিল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা; মনে হল মন্দার ধাক্কায় ধনতন্ত্র চুরচুর করে ভেঙে পড়বে। কিন্তু তা ঘটে নি। জারমানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিবাদ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তারপর স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং ফ্রাঙ্কোর বিজয়। ফ্রানসে পপুলার ফ্রনটের পতন। নিঃসন্দেহে বিপ্লবী আন্দোলনের পশ্চাদপসরণের পর্ব। কল্পনাবিলাসীদের স্বপ্নভঙ্গের যুগ।

এই পটভূমিকায় war of position একমাত্র পথ। এই পথের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, অসংখ্য মানুষের বিপুল আত্মত্যাগ ('The war of position demands enormous sacrifices by infinite masses of people')। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের অবরোধ। দীর্ঘদিন অবরোধ দুর্ভেদ্য থাকতে পারে। ইটালির ফাসিসটতন্ত্র শুধু বুরজোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত "প্রতিবিপ্লব" নয়। ফাসিসটতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে শিল্পায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সমবায়ের মাধ্যমে। শহর আর গ্রামের পেটি-বুরজোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, আর এই প্রত্যাশা রাষ্ট্রের দমননীতির ভিত্তি তৈরি করেছে। এই নতুন বাস্তবের স্বীকৃতি এবং বিশ্লেষণ গ্রামসচির লেখায় প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে তিনি গান্ধী-পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখ করেন। ব্রিটিশবিরোধী এই সংগ্রামে দুটো পথই দৃশ্যমান। শ্রমিকদের ধর্মঘট-সংগ্রাম war of movement; কিন্তু "বয়কট" হল war of position। শত সহস্র মানুষের যোগদান "বয়কট" আন্দোলনের শক্তির উৎস। ব্রিটিশ পক্ষ থেকে প্ররোচনা আসতে পারে, যাতে অপরিণত সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা হয়। আর তা হলে তারা সাধারণ আন্দোলনের শিরশ্ছেদ করতে পারবে। দীর্ঘস্থায়ী "নিষ্ক্রিয় বিপ্লব" চূর্ণ করা দুঃসাধ্য। অবশ্য গান্ধীবাদে ধর্মের প্রভাব পড়েছে।

পশ্চিম ইউরোপে ১৮৭০-এর পরে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। ইউরোপের "ঔপনিবেশিক বিস্তার", রাষ্ট্রের নব-নব রূপ, উদারনীতিবাদের বিকাশ, ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার, শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা এই নতুন অধ্যায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় ধনতন্ত্রকে সরাসরি আক্রমণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের কর্মসূচী। অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন অবশ্য ঘটতে পারে, যখন সৃষ্টি হবে war of movement-এর সম্ভাবনা। মনে হয়, বিশেষ অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রামসচি নাকচ করেন নি। লেনিনবাদে তাঁর প্রত্যয় অবিচল।

৫

মাত্র এক বছর (১৯২২-২৩) তিনি কমিউনিসট

আন্তর্জাতিকের (সংক্ষেপে কমিনটারন্) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাধারণভাবে তিনি কমিনটারনের নীতি আর নির্দেশ মেনে চলেছিলেন। ইলিচ (লেনিনকে এই নামে তিনি সম্বোধন করেছেন) তাঁর কাছে প্রায় অভ্রান্ত। মৃত্যুর এক বছর আগে রাষ্ট্রব্যবস্থা, অবিরাম আন্তঃপার্টি কলহ, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লেনিনের মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাঁর শেষ চিঠিপত্রে মোহভঙ্গের সুর কানে বাজে (Lewin, Lenin's Last Struggle দ্রষ্টব্য)। রুশ পার্টিতে স্তালিন-বুখারিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সমর্থন করলেও আন্তঃপার্টি সংগ্রামের রূপ আর পদ্ধতিকে গ্রামসচি কঠোর সমালোচনা করেছেন। দুর্লভ সাহসের সঙ্গে তিনি রুশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে মতামত জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর সাবধান-বাণী অবিস্মরণীয়। পার্টির মধ্যে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা "যান্ত্রিক" হতে পারে না; উপর থেকে "জোর করে" শৃঙ্খলা চালু করা ভুল। "লেনিনবাদী নীতি" পার্টির মধ্যে ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম। রুশ পার্টি সেই নীতি থেকে বিচ্যুত। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, বল-শেভিক পার্টির যা ছিল শক্তির উৎস সেই ঐক্য রক্ষা করা বোধহয় সম্ভব হবে না। স্তালিনপর্বে রুশ পার্টির ঐক্য সত্যি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কমিনটারনের ষষ্ঠ কংগ্রেসে বামপন্থী নীতি গৃহীত হয় (ভারতের কমিউনিসট আন্দোলন এই চরম সংকীর্ণতাবাদী নীতির মারাত্মক ফলাফল হয়তো অনে-কের মনে পড়বে)। ইটালিতে মুসোলিনির শাসনের ভিত্তি ক্রমশ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও বাম-নীতি অনুসৃত হতে থাকে, বিশেষ করে ১৯২৮-২৯ পর্বে। পুরনো পার্টি সম্পাদক বোর্ডিগা সহ অনেক নেতা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। পার্টির সভ্যসংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। ১৯২৫-এ সভ্যসংখ্যা ছিল ২৭ হাজার; ১৯২৭-এ ছ হাজার, আর ১৯৩৪-এ মাত্র আড়াই হাজার। তোগলিয়াত্তি সহ বিশিষ্ট নেতারা তখন মসকোতে। অবশেষে সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) গৃহীত হয় সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম মোরচা গঠনের নতুন কর্মসূচী। আর এই কর্মসূচী প্রণয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন গ্রামসচির বন্ধু তোগলিয়াত্তি, যার নেতৃত্বে ইটালির পার্টি পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম কমিউনিসট পার্টি হয়েছিল, অদ্যা-বধি যে পার্টির প্রভাব অটুট। গ্রামসচির Prison Notebooks-র প্রথম পাঠকদের অন্যতম তোগ-লিয়াত্তি।

৬

গ্রামসচির ভাবাদর্শ ইটালির পার্টির কর্মসূচীকে প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণ ইটালির সমস্যা বুঝবার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ বিভাগের প্রধান নাপলিটানো (Napalitano) মার্কসবাদী ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ হবসবমের সঙ্গে গ্রামসচির অবদান সম্বন্ধে বলেছেন। গ্রামসচির জীবনের প্রধান পর্বগুলি এইরকম: Ordine Nuovo-র পর্ব, ১৯২৩-২৬ পর্ব, Prison Notebooks-র পর্ব। শুধু ধ্বংসাত্মক ভূমিকা নয়, শ্রমিকশ্রেণীর গঠনমূলক ভূমিকার পরি-প্রেক্ষিত গ্রামসচির চোখে ধরা পড়েছিল। মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের সময়ে চলছিল যুদ্ধোত্তর সমাজের সর্বাঙ্গীণ ভাঙন। ভাঙনের মুখে ভাসমান ইটালিকে পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা সেদিন পার্টির ছিল না। ধনতন্ত্রে সংকট অনিবার্য। তীব্র সংকটের সুবিধাভোগী হতে পারে দক্ষিণপন্থী শক্তি (যেমন জারমানি)। তীব্র হতাশা প্রতিবিপ্লবের উৎস। কমিউনিসট পার্টি সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙনের পথ প্রতিরোধ করবে, তারা উপস্থিত করবে অর্থনীতির পুনর্গঠনের পথ। তাঁদের কর্মসূচীর অঙ্গ পুঁজিবাদের "কাঠামোগত সংস্কার", আর এই সংস্কার হবে সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা। সংস্কারের এই নব কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে পার্টির ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব (hegemony)। ভাবাদর্শগত

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা কমিউনিসটদের মৌল লক্ষ্য। অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া চলবে ওই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য। সোজা সরল পূর্বনির্দিষ্ট পথ ধরে ইতিহাস অগ্রসর হয় না। ১৯২৬ থেকে ১৯৪৮-পর্বের ইতিহাস এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। ইতিহাসের ধারা সর্পিল, ছকে বাঁধা নয়।

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি দিক উল্লেখ্য। আবার আমরা চলি দক্ষিণ ইটালিতে। সত্তরের দশকে মেটায়ার (metayer)-প্রথা ভেঙে পড়েছে; জমিচ্যুত প্রজা খেতমজুরে পরিণত হয়েছে। জমি বণ্টনের পরিকল্পনা তেমন অগ্রসর হয় নি; প্রবল বাধা এসেছে প্রচ্ছন্ন ফাসিসটদের কাছ থেকে। বছরের পর বছর গড়ে উঠেছে কৃষি-সমবায়, আর ত্রিশ হাজার সমবায়গুলির আঠারো হাজার কমিউনিসটদের দখলে। তাঁরা গঠন করেছেন খেতমজুর আর গরিব কৃষকদের সমিতি। বনাঞ্চলে নিযুক্ত কৃষি-শ্রমিক এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। মাঝে-মাঝে সমিতির আহ্বানে ধর্মঘট হয়। তবে বিস্তর সমস্যা। কৃষি-উৎপাদনের হার নিম্নমুখী। কৃষি-কাজে আধুনিক তরুণদের অনীহা। সুযোগ পেলে কৃষক-মেয়েরা শহরের শ্রমিককে বিয়ে করে। দক্ষিণ ইটালি এখনো ম্লান বিবর্ণ। গ্রামের মানুষ দল বেঁধে যায় শহরে কাজের সন্ধানে। তবুও দক্ষিণে পার্টি সক্রিয় এবং পরিবর্তনে আস্থাশীল। বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করার পরিচিত প্রবণতা ইটালির পার্টি দলিলে চোখে পড়ে না। তন্ন-তন্ন করে বাস্তবকে বোঝার মধ্যে গবেষণার সার্থকতা।

কোনো কমিউনিসট নেতা এগারো বৎসর ফাসিসট বন্দীশালায় ভয়াবহ নির্যাতন আর শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন নি, যেমন করেছেন গ্রামসচি। লেনিনের পরে আর কোনো মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী গ্রামসচির মতো সমাজবিজ্ঞান এবং বিপ্লবের কর্মসূচী সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্ব প্রচার করেন নি। বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা, কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীর মোরচা, সামাজিক ভাঙনের মুখে শ্রমিকশ্রেণীর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শগত নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, নিষ্ক্রিয় বিপ্লব, পার্টির মধ্যে ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম সম্বন্ধে গ্রামসচির চিন্তা অবিস্মরণীয়। বর্তমান লেখকের প্রত্যয়, ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে গ্রামসচির চিন্তা অদূর ভবিষ্যতে গভীর ও স্থায়ী আলোড়ন সৃষ্টি করবে। উগ্র বাম-পন্থীরা যাই বলুন, ভারতীয় বাস্তব বুঝবার জন্য গ্রাম-সচির চিন্তা বিশেষ উপযোগী।

নির্বাচিত বইয়ের তালিকা

1. সুশোভন সরকার, The Thought of Gramsci, 1968, Towards Marx, Papyrus, 1983 দ্রষ্টব্য।
2. কার্ল মারজানি, The Promise of Eurocommunism, Lawrence Hill, 1980.
3. অ্যানটোনিয়ো গ্রামসচি, Selections From Prison Notebooks, edited by Q. Hoare and G. N. Smith, International Publishers, 1971.
4. The Italian Road to Socialism : An Interview by E. Hobsbaum with G. Napolitano, Lawrence Hill, 1977.

যদুনাথ-ভবনে অনুষ্ঠিত গ্রামসচি সম্বন্ধে সেমিনার (জুলাই ১৯৮৭) আমার উপকারে এসেছে।

ম্যাড্রিগাল

মঞ্জুভাষ মিত্র

দর্শনা, জানুদীর্ঘ তোমার উজ্জ্বল চুল
হৃদয়ের স্বপ্নের আশ্রয়!

প্রবাহিত হয়ে গেছে অনেক সময়
মানুষের ইতিহাস, স্বপ্নবস্তু, স্তম্ভ ও মিনার
সমস্ত তোমার দিকে ছুটে-ছুটে আসে
যোজন-যোজন যুগ অতিক্রম ক'রে
সংলগ্ন হতে চায় সৌন্দর্যের খাঁজে-খাঁজে
পৃথিবীর শাশ্বত বলয়ে

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অন্তিম নিশ্বাস ফেলে গেছে
শ্রমরাঙা একগুচ্ছ বনপশুর মতো
তাদের নিকটে আসতে দেয় নি কী এক অদ্ভুত বাধা
ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হল চন্দ্রসূর্য তোমার দুপাশে

এখনো সময় আছে
এখনো তরুণী তুমি সরল বিশ্বাসে
পৃথিবীর রীতিনীতি নিয়মের বাধা ভেঙে ধরা দাও
মানুষের সবকিছু স্তম্ভ, মিনার, মাংস ও গোলাপকে
তোমার নিকটে অনায়াসে আসতে দিও তুমি
তুমি তো জান না তোমার রূপের শেষ নেই
এখনো তোমার নামে ম্যাড্রিগাল লেখা হবে
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কত
একমাত্র তুমিই জুড়াতে পার হৃদয়ের ক্ষত

আবিষ্কারের চেয়ে বস্তুত ভালো কিছু নেই
বিভিন্ন বন্দরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে হবে
সংশোধন করে নিতে হবে সবকিছু ভুল
আবার নূতনভাবে নির্দেশ দাও;
দর্শনা, তোমার উজ্জ্বল চুল—মুখচ্ছবি
অনেক বেদনা ও অন্ধকারের পারে
হয়ে আছে মানুষের স্বপ্নের আশ্রয়!

বৃত্তের বাহিরে ডেকো

মৃণাল চক্রবর্তী

মনে রেখো, ও জল চোখের থেকে হৃদয়ে নেমেছে
সারাদিন তুলি হাতে কাটিয়েছি বৈঠকখানায়
বাজারে, দোকানপাটে, গণিকারা ডেকেছে আমায়
সকাল দুপুর যায়, যায় বেলা, আর যায় কে কে?
তুলি হাতে নেমে গেছি পাহাড়ে বন্দরে সারাদিন
ইজেলে পড়েছে আলো, ধু-ধু রোদে বুকে হল খরা
ও নদী কেমন নদী? পার হব শ্রেণীবদ্ধ চড়া
খাত, বালি, স্মৃতি থেকে দূরে যাই—ধুলো থেকে—ক্ষীণ।

যা হোক আড়ালে থেকো, ওষ্ঠের ও বৃত্তের বাহিরে
ছবি আঁকা হয় নি এখনো, হয়ে গেলে ছাখাব তোমাকে
ছোঁব উজানের পাড়ে, যদিও এখন সন্ধ্যা ডাকে
সদর দরজা থেকে ডাকে কারা? তুমি দেখ ফিরে
ঘুমন্ত আমার হাত প্রার্থনায় ডুবেছে বৈশাখে,

আমি যদি অন্ধ হই, ডেকে নিয়ো বৃত্তের বাহিরে।

ভাষা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

অথচ সমগ্রদিনরাত তারা খুঁজেছে সমুদ্রভরা ভাষা।

জম্বুদ্বীপ, ইলাবৃত থেকে এসে দেখে নিচ্ছে কতিপয় বয়স্ক মানুষ
চতুর্দিক ঘিরে কালো শব্দমেঘ, অন্ধকার, বর্ষণবিহীন।
কিছু নাগরিক শব্দ দেয়াললিপিতে শত্রুনিপাতন করছে
ময়দানে ফলিয়ে ছাড়ছে অলীক ফসল।
প্রত্যেকের ত্রেনে বাড়ছে দ্রুতলয়ে ত্রোকাক্ষেত্র
কেবল নিরর্থ জলোচ্ছ্বাস……

চেয়েছিল জ্যোৎস্নাময় জলবিভাজিকা
যেমন শব্দের ভ্রূণ ধ'রে রাখে : অথবা সমর্থ তরবারি
কেটে নেবে শব্দমেঘ, লিপিমালা সাজাবে বিদ্যুতে।

আত্মদীপ

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

যেহেতু যন্ত্রণার বৃন্ত আপন হৃদয়
অংশীদার নেই কোনো যন্ত্রণার।
বারাঙ্গনা-সুখ চিত্রল হরিণের মতো
প্রতারক।
আপন বক্ষের ক্রুশ অনিবার্য নিয়তির মতো
বয়ে যেতে হয় নিজেকেই।
পান করে যেতে হয়
আগ্নেয় অমৃত।
পথপ্রান্তে নেই কোনো শ্রান্তিহরা সান্ধ্য পান্থশালা
প্রতীক্ষায়—সাধ্বী রমণীর মতো।
ঝড়ের ঝাপটায়
আড়াল দেবে না কোনো ব্যগ্র করপুট, তাই
ধাত্রীর লালন শুধু দীর্ঘ তিতিক্ষায়
যতদিন না বুকের আড়ালে নিভু-নিভু দীপশিখা
হয়ে ওঠে নিবাত-নিষ্কম্প।

বাংলা কবিতা

সমর সেন

কবিতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী সেটা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ, কিন্তু সঠিক নয়, কারণ অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিস নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগৎ। এ সূত্রে কবিতার ভাষা ও ভাষার ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে জন্মাই, এবং সামাজিক জীব হিসেবে প্রচলিত কোনো ভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু কবিতা লেখার সময় সে ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিক্‌শন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক। অথচ এই পুরুষকার কাজ করে বহু শতাব্দীর শ্রমলব্ধ জটিল ব্যাকরণের সাহায্যে, এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায়। কবিতা অনেটা নাটকীয় স্বগতোক্তির মতো, কিন্তু কাব্যবিচারে আমরা নাটকের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করি কিংবা অস্বীকার করি। পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরতা অস্বীকার করা অসম্ভব। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা, মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত।

এখনো অনেকে বিশুদ্ধ কবিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন ; এঁরা হচ্ছেন পূর্বযুগের ক্রিশ্চানদের মতো যাঁরা কুমারী মেরীর বিশুদ্ধ গর্ভধারণে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। কবিতার কারণ এঁদের কাছে অনাবিল অন্তঃপ্রেরণা, অন্তঃপ্রেরণা এঁদের কাব্যলোকের নিরাকার ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। একটি সহজ সত্য এঁরা ভুলে যান যে ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস হত তাহলে প্রতি বছরে, প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে মহৎ কবিতা রচিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে-মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য। আমরা কিন্তু একটিকে মানলে অপরটিকে অবহেলা করি, মনে করি কাব্যের ঈশ্বরকে মানলে সমাজের কুবেরকে মানা অসম্ভব।

এসব কথা বলার প্রয়োজন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বোধ করি নেই, কিন্তু বাংলাদেশে যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে দেখলে এ কথা সহজে বোঝা যায় যে কাব্যবিচারের পার্থক্য প্রকৃত কাব্যরচনাকে কী ভাবে প্রভাবান্বিত করে। যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাঙালি কবিদের মধ্যে এখনো বেশি, তাঁদের লেখায় ভারসাম্য ক্রমশই কমে আসতে থাকে, এবং তাঁদের প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ম্যানারিজিমের প্রকাশে, পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কাব্যে মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং মূলসূত্রহীন কাব্য এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতির নামান্তর।

কবিতা অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে ; এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলতে চলতি ভাষায় সাধারণত আমরা হৃদয়াবেগ বুঝি। কিন্তু হৃদয়াবেগেরও প্রকারভেদ আছে। বাংলা কবিতার অধিকাংশ এত নির্জীব তার কারণ আমাদের কাব্যে significant emotion-এর একান্ত অভাব। এর জন্য মূলত দায়ী ভারতীয় ইতিহাসের গতি, এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের শেষের দিকের প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যে যুগ জন্ম দিয়েছিল, সে যুগের প্রাণশক্তি বহুপূর্বে নিঃশেষিত। তাঁর সময়ে যেটা ছিল কাব্যের বিষয়বস্তুর উপযুক্ত, এবং যে ভঙ্গিতে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের জীবনশক্তি আজকে নেই। এসব প্রসঙ্গ অনেকটা অবান্তর। কিন্তু যুগধর্মের, কালান্তরের কথা মুখে বললেও এদের প্রকৃত অর্থ অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। সেজন্য মাঝে-মাঝে অতি-সাধারণ কথার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগতিক ফলাফলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে মাইকেলের মতো কবি ছিলেন, কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের মতো উল্লেখযোগ্য কবি হয় নি। দাসদেশে বুর্জোয়া সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দমিত হয়, কারণ বর্ধিষ্ণু দাসদেশ বুর্জোয়া প্রভুর স্বার্থ বিরোধী। কয়েকদিনের ক্ষিপ্র চকিত প্রগতি, তারপর নিরুদ্ধ গতি, এদের দোটানায় আর যাই হোক, কোনো দেশীয় প্রাণবান ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই দোটানার প্রভাব বর্তমান।

তাই আমাদের কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। এক হিসেবে ভারতের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য রবীন্দ্রনাথে শেষবারের জন্য স্বধর্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। যে স্বতন্ত্র দেশীয় ঐতিহ্যের গৌরব আমরা করি আসলে তা স্বাবলম্বী নয়, বর্তমানে তার নিজস্ব মেরুদণ্ড নেই। এর অভাবে বিচারবুদ্ধিকে আমরা বরাবর বিসর্জন দিয়েছি, অনুভূতির নামে ভাববিলাসের জয়গানে আমরা মুখর। রোমান্টিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বিশেষত্ব, বিচারবুদ্ধির ও অনুভূতির মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য টানা, এবং প্রথমটির বিসর্জন, আমাদের দেশে উর্বর ভূমি পেয়েছে। এ ধারার সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণব কবিতার ভাববিলাস। আমাদের কবিতার রক্তস্বল্পতার এটি একটি কারণ, অবশ্য এর প্রধান কারণ লেখক ও সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান। ইচ্ছে থাকলেও এ ব্যবধান কাটিয়ে ওঠা বাঙালি কবিদের পক্ষে কঠিন। ভাবের ও ভাষার যে ভঙ্গিতে আজকাল তাঁরা অভ্যস্ত সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার সহজ যোগসূত্র নেই। পৃথিবীর সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পরিচিত করেছে বটে, কিন্তু বণিক সভ্যতার গতিতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে, সত্যিকার শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিতের মধ্যে দুস্তর পারাবারের সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের অসংখ্য লোকের অক্ষরজ্ঞান নেই, সুতরাং লেখক ও পাঠক বলতে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বোঝায়। এই রেডিও-পীড়িত, সিনেমা-জর্জরিত, ফুটবল-উৎকণ্ঠিত শ্রেণীর জীবনযাত্রা শেষ পর্যন্ত মহৎ কবিতার পরিপন্থী। ফলে আমাদের দেশের বিশিষ্ট

আধুনিক কবিরা নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গতায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো আমূল সমাজবিপ্লব না ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না ধরে, ততদিন এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস, বর্তমান সভ্যতার যেগুলি বিশেষত্ব, তাঁদের ঘিরে থাকবে, ততদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূলসূত্রের অভাবে পীড়িত হবে। ইতিমধ্যে নেই মামার চেয়ে কানা মামার অন্বেষণ করাই ভালো। রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ। অন্যদিকে সাংসারিক চেতনা আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহায্য করতে পারে, কারণ সচেতনতা, এমন-কি নিজেদের সামাজিক ব্যর্থতার সচেতনতাও, ক্ষমতা এবং সংযম আনে। কালক্রমে যখন তাঁদের বিষয়বস্তুতে আসন্ন পরিবর্তনের ভাঙন ধরবে তখন অন্তত সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরবর্তী যুগের কবি এবং পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন।

"কবিতা" পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৪৫ সংখ্যা (বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

তন্মাত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুভাষ ঘোষাল

সেই পর্বে আমি পেয়ে গেলাম অপর্ণার বাবার শ্রাদ্ধ-বাসর। সাদা শামিয়ানা বাতাসে কাঁপছিল একটু ভারী রাতে। অপর্ণার বাবা শেষ কদিন খুব যন্ত্রণা পেয়ে চলে গেছেন। তার আগে দশ বছর ধরে তিনি একটার পর একটা বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, উদ্যোগী হয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু মাঝপথে আবার সবকিছু থেকে সরে এসে নিজের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। সেই দশ বছরের অনেক মুহূর্তে তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি কথা বলতেন কম। কিন্তু যখন কথা বলতেন কথার মধ্যে থাকত অনুভবের দোলা। আমাকে তিনি দু-তিন দিন ধরে একবার বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে যে নৈঃশব্দ্য দাঁড়িয়ে আছে তার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। যৌবনে তিনি এক ওষুধের কারখানার অভিভাবকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তখন তাঁকে কর্মসূত্রে এমন একটা শহরে যেতে হত যেখানে নদী আর পাহাড়ের সহাবস্থানে গভীর নিসর্গ হয়েছিল। তিনি কাজের শেষে নদীর পাড়ে বসে থাকতেন। কখনও-কখনও আপন মনে হাঁটতে-হাঁটতে শুনতে পেতেন বিশ্বাসের ডাক—তুমি আমার মধ্যে এসো। তুমি আমার মধ্যে এসো।—পাহাড়ের ওপরে একটা মন্দির ছিল। বছরের এক-একটা দিনে বহু দূরের মানুষ সেই কঠিন পাহাড়ের গা বেয়ে অসম্ভব উৎসাহে চূড়ার মন্দিরে উঠে যেত। অপর্ণার বাবা যাতায়াতের পথে অসংখ্য মানুষের সেই একাগ্র আরোহণ দেখেছেন। তাঁর নিজের পক্ষে সেই উৎসাহ কোনো দিনও ছিল না যার দ্বারা চালিত হয়ে পাহাড়ের পথ চুম্বন করা যায়। একবার তাঁর একটি পা আস্তে-আস্তে খরচের খাতায় চলে যেতে লাগল। তাঁর কর্মসংস্থানের অভিভাবক তাঁর পায়ের জন্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার সুযোগ করে দিলেন। তিনি ভিতরে এবং বাইরে গ্রহণ করতে লাগলেন সুসভ্য বৈদ্যদের সুচিন্তিত সব ওষুধ। কিন্তু বুঝতে পারলেন সবই শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যাচ্ছে, কেউ

কোনো সাহায্যে লাগছে না। সেই অসুস্থ পা নিয়ে তিনি জোর করে তাঁর শহর থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের একটা দায়িত্ব বহন করে কিছুদিনের জন্য নদী আর পাহাড়ের সেই শহরে আবার এসে পৌঁছলেন। সারা-দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে নানা বর্ণের ওষুধ খেতেন এবং রাতে বাড়ি ফিরে অসুস্থ পা-টিকে সঁপে দিতেন ভৃত্যের কোলে। সেদিন রবিবার। তেমন কোনো কাজ নিয়ে ভুলে থাকার যো নেই। তবু রসায়নের বই পড়ে সারাদিন কাটালেন। সন্ধের দিকে মন আর কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না। বহুদিন বাদে থোঁড়াতে-থোঁড়াতে নদীর পাড়ে এসে বসলেন। হাওয়া দিচ্ছিল। নক্ষত্র ঊর্ধ্বকে করে রেখেছিল সুস্নাত। বহুক্ষণ পরে বাড়ি ফেরার জন্য উঠেছেন। নিজেও জানেন না চলতে-চলতে কখন সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে শুরু করেছেন। কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলেন বাতাস বেজে উঠে বলছে—তুমি আমার মধ্যে এসো। তুমি আমার মধ্যে এসো। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলেন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে সাদা মন্দির পর্যন্ত একটি বিরাট হাতছানি—এসো, এসো, এসো, এসো হে।—সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না। পরের দিন ভোরে উঠে স্নান করে তিনি ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়ালেন পাহাড়ের পাদদেশে। দেখলেন মানুষের পর মানুষ প্রেম আর প্রযত্নে ওপরের দিকে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। আর সেই সমবেত আরোহণের আলোয় পাথরে নেমে এসেছে বরাভয়। তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে সেই ওপরের পথকে আলিঙ্গন করতে শুরু করলেন। কতক্ষণ পরে সাদা মন্দিরের কোলে এসে উঠলেন তা তিনি জানতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছিলেন মর্মে-মর্মে, তাঁর যে পা-কে তিনি এতদিন অশক্ত বলে মেনে এসেছিলেন তা হয়ে উঠেছে সহায়ক এবং শক্তিমান।

তিনি ঠিক কোন্ সময়ে মারা গিয়েছিলেন কেউ জানতে পারে নি। চলে যাবার আগে জানলার পাশের খাটটিতে শুয়ে তিনি কোনো শব্দ না করে দগ্ধ হচ্ছিলেন। এইভাবে কেটেছিল অন্তত একমাস। সেইসব সময়ে তিনি যে বেঁচে আছেন তা একমাত্র প্রমাণ করতে পারত তাঁর চোখ। অফিস থেকে ফিরে রাতের দিকে তাঁর খাটের সামনে একবার গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে পড়াটা আমার অভ্যাসেরও অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল। তখনই দুটো চোখ পূর্ণশ্রী নিয়ে ফুটে থাকত। আমি মাসিমা, অপর্ণা, শোণিমা কিংবা সুজনদা যাকে যখন পেতাম ইঙ্গিতে ওই চোখ দেখিয়ে দিতাম। তাঁর খাটের নীচে প্রতিদিন বিছানা পড়ত। অধিকাংশ দিনগুলিতে সুজনদা বাবার নীচে শুয়ে রাত কাটাত। এই পর্বতাভিযাত্রী যুবকের কাছে মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে লক্ষ করে রাত কাটানো তেমন কোনো শ্রমের কাজ ছিল না। মাঝে-মাঝে সুজনদাকে দু-একদিনের জন্য হলেও তখনও ছুটে যেতে হত বাইরে তার সঙ্ঘের কাজে। সেই অনুপস্থিতির সময়ে শোণিমা তার দিদিকে নিয়ে বাবার নীচে শুয়ে পড়ত। দুজন বাবার সাশ্রু নীরবতার মাঝখানে নানা কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ত। সেদিনও ছিল তেমন এক রাত। সুজনদা বাইরে। মাসিমা পাশের ঘরে। শোণিমাকে নিয়ে অপর্ণা বাবার ঘরের মেঝেতে অনেকক্ষণ গল্প করে ঘুমিয়েছে। অপর্ণার ঘুম ভাঙে ভোরে। উঠে দেখে বাবার শিয়রে সরলতম আলো এসে পড়েছে। কিন্তু বাবার চোখে ঝরে যাবার চিহ্ন। সে শোণিমাকে ডেকে যৌথভাবে বাবাকে নানাভাবে ডাকতে শুরু করে এবং মাসিমা সেই ঘরে এসে দাঁড়ালে জ্ঞানত বুঝতে পারে বাবা আর নেই। শ্রাদ্ধের আগে মৃত্যুর সময় নিয়ে বেশ সংকটের সৃষ্টি হয়। রাত বারোটার পর থেকে ভোরের পূর্ব পর্যন্ত যে সময় তার কোন্ বিভাগকে ধরা হবে? শেষে সমবেত সিদ্ধান্ত হয় অবসান যখন ভোরেই প্রথম ধরা পড়ল তখন ভোরই হবে অবসানের ব্যবহারিক কাল।

সেই ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছিলেন মা। —নালীক ওঠ, অপর্ণা এসেছে। বিধুবাবু চলে গেলেন।

—উঠে দেখলাম আমার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি তাকে আমি একযুগ ধরে দেখে আসছি। প্রথম যখন সুজনদার সঙ্গে তাদের বাড়ি যাই সে তখনও ফ্রকের মধ্যে আছে। কালো-কালো কিন্তু লাবণ্যময় হাত-পা। সহাস্য এবং সপ্রতিভ। সফেন কফির কাপ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। —তুমি নিশ্চয়ই অপর্ণা?

—হ্যাঁ। আপনি কী করে বুঝলেন?

—সুজনদা বলেছিল, দেখবি যে ফেনায় ভরা কফির কাপ নিয়ে এসে দাঁড়াবে সে অপর্ণা। আর যে তোর সামনে একেবারেই আসতে চাইবে না শোণিমা তার নাম। তুমি তো গানের চর্চা কর। গান শোনাবে?

—আজ এখনই শুনবেন?

—আজ এখনই শুনতে ইচ্ছে করছে।

—ঠিক আছে, আপনি কফি খেয়ে নিন। আমি একটু পরে আসছি। একটু পরে সুজনদা এল, অপর্ণা এল, মাসিমা এলেন। অপর্ণা শতরনজি পাতল। হারমোনিয়াম এবং তবলা নামাল। তখন অপর্ণা হারমোনিয়াম বাজাতে সাহস পেত না। মাসিমা হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। তবলা ঠিক করতে-করতে সুজনদা বলল—অপু, ঠিক করে গাইবি। নালীক কিন্তু মুখের ওপর সমালোচনা করে।—ঠিক প্রার্থনার ভঙ্গিতে অপর্ণা বসেছে। মাসিমার আঙুল হাঁটছে। সুজনদা প্রস্তুত। এই সময় সুজনদার ডাকে শোণিমা ধীরে-ধীরে এসে শতরনজির এক কোণে বসেছিল। একযুগ আগের সেই সরলতা অপর্ণার মধ্যে ফুটে উঠেছে।—কী হবে নালীকদা? দাদার আজ বিকেলে ফেরার কথা।

তেমন কিছুই হবার ছিল না। সঙ্ঘের কাজ থেকে ঠিক বিকেলেই সুজনদা ফিরে আসে। শুধু সমস্ত নিয়ম পালনের পর আমরা সবাই যখন সরে এসে আগুনের দায়িত্ববোধ লক্ষ করতে যাচ্ছি, অপর্ণা সেই সান্ধ্য শ্মশানে সকলের মাঝখানে আমার হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকেছিল।—নালীকদা, তুমি যে বলেছিলে বাবার এখন কোনো মৃত্যু নেই।—আমি কখন কাকে কী বলেছিলাম জানি না। আমার তালু সজল হচ্ছিল। সেই প্রথম এবং সেই শেষবার আমার জানা হয়েছিল চোখের রস কতখানি সক্ষম হতে পারে।

শ্রাদ্ধবাসরে সাদা কাপড় উড়ছে। ঝড় উঠেছে না কি? খাওয়া-দাওয়া শেষ। এই তো শেষ দল মুখ মুছতে-মুছতে চলে গেল; এই তো শেষ হল একেবারে ঘরের লোকদের কারও-কারও মিষ্টি বেছে খাওয়া, কারও-কারও শরবতে চুমুক। অনেক আগে আমি খাওয়ার ঝামেলা মিটিয়েছি। পাতের কাছে সুজনদা নিজে এসে দাঁড়িয়েছিল। নালীক, তুইও কি লজ্জা করবি?

—তুমিও কি আজ ভুলে গেলে আমি সত্যি কতটুকু খাই?

—তাই বলে এত কম খাবি? মনে নেই বাবা তোকে বসিয়ে লুচি ছোলার ডাল খাওয়াতেন।

সুজনদার গলায় অন্তত আজকের জন্য এসে পৌঁছেছে সমতলের সুর।

অপর্ণা শরবত খেয়ে ছাদে উঠে গিয়েছে। এতক্ষণ তাদের দোতলার ঘরে বসে আমি এত ভিড়ের মধ্যেও বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। প্রথমে অবশ্য টেনে নিয়েছিলাম খবরের কাগজ। কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়লে অনেক কিছু নিশ্চয়ই জানা যায়, হওয়া যায় তথ্যশিকারি। চায়ের টেবিলে অথবা রাস্তাঘাটে অথবা উৎসবের সন্ধেগুলিতে নানা তথ্য কথা চালিয়ে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। কিন্তু এই তথ্যের সমাবেশের দ্বারা এমন এক গতির উৎপত্তি হয় যা কিছুক্ষণ বাদে আমাকে খুব ক্লান্ত করে দিয়ে যায়। আমি ট্রেন-দুর্ঘটনার পাশেই পেয়ে যাই মেয়েদের অস্বস্তির দিনগুলিতে কী ক'রে স্বস্তি পাওয়া যায় তার বড়ো উপায়। বুনো হাতির আক্রমণের পাশেই জাতীয় অতিথির নৈশ খাদ্যতালিকা আমার জানা হয়ে যায়। উপনিষদের উচ্চারণের নীচে ঝলমল করে নারীর সুমার্জিত দাঁতের হাসিরাশি। আমি খুব

দিশেহারা হয়ে পড়ি। এত মঞ্চ, এত আলোকসম্পাত, এত দলবদ্ধতা আমার ঠিক সহ্য হয় না। তাই আজকাল শিরোনামগুলি নিজেকে দেখিয়ে নিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করি। শিরোনাম দেখতে গিয়ে কোন-কোন উদ্দীপক সংবাদ মাঝে-মাঝে নজর এড়িয়ে যায়। আজও যাচ্ছিল, কাগজ সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আমি যে ঘরে বসে ছিলাম সেই ঘর হঠাৎ শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে গেল কয়েকজন বৃদ্ধের দলবদ্ধ প্রবেশে। কোনো সংলাপে যোগ দেব না, চুপ করে বসে থাকব, এই ছিল লক্ষ্য। কাগজ আবার মুখের সামনে মেলে ধরে উপলক্ষের সৃষ্টি করলাম। তখনই চোখে পড়ল, একজন শিল্পী সরকারের দেওয়া পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে-কাজের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তার কোনোই গুরুত্ব নেই। এই বড়ো খবরটাকে ছোটো করে এক কোণে ছাপানো হয়েছে। বৃদ্ধদের দল থেকে আমাকে যে লক্ষ করা হচ্ছে তার কোনো প্রমাণ পেলাম না। এই দলটি কীর্তনের আলোচনায় এনে ফেলছিল নানা কণ্ঠের নানা রকম স্মৃতিসূত্র। আমি কাগজ রেখে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলাম পাড়ার দুর্গামণ্ডপের পত্রিকা। এবারে যাদের হারিয়েছি এই পর্যায়ে কয়েকজনের ছোটো-ছোটো ছবি দিয়ে দুটি পাতা পূর্ণ করা হয়েছে। আমি দুজন ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলাম না। মৃতদের এই ছবির সংকলনে নানা বয়সের মানুষ। এমন কি এক শিশুকেও রাখা হয়েছে। পাড়ার এত লোক কোনো শব্দ না করে চলে গেছে? যে শিশুটি চলে গেছে, যে তিনজন যুবতী হাসছে, যে যুবক আর প্রবীণেরা একে অপরের পাশে ফুটে আছে তাদের জন্য আমার দুঃখ হল। কিন্তু যে দুজনকে আমি চিনি, যে দুজনের কাছে আমাদের ঋণ রয়ে গেছে, যে দুজন একদিন সত্যিকারের শ্মশানবন্ধু হয়েছিল তাদের ছবি দেখে আমার বিশ্বাস ব্যাহত। সুদিন আর দীপন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল? এই তো সেদিন একজন গান গেয়ে আর একজন চিতায় কলসীর পর কলসী উপুড় করে শ্মশান ভরিয়েছিল।

বৃদ্ধরা সদলে এক সময় নেমে গেছেন। শোণিমা আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ছাদ প্রবল বিদ্যুতে বাঁধা পড়েছে। ছাদের তিনটি বিভাগ হয়েছে। সবচেয়ে ছোটো ভাগ পড়েছে রান্নার এলাকায়। এবার একদিকে খাওয়া-দাওয়া অন্যদিকে সকালে শ্রাদ্ধ, সন্ধেবেলায় কীর্তন আর মানুষের ওঠা-বসা। ঠাকুররা নামছে। তারা বসে না খেয়ে তাদের খাবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার অংশে কাঠের পর কাঠ পড়ে রয়েছে। আকৃতি-প্রাপ্ত সব দারু, তা ছাড়া কিছু নেই। শুধু শ্রাদ্ধের অঞ্চলটিতে পা ছড়িয়ে বসে টুকরো-টুকরো কথা যারা বলে যাচ্ছে তারাই তো মাসিমা, অর্পণা, সুজনদা, শোণিমা। মাসিমা হেসে আমাকে দেখলেন—নালীক, তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। তুমি কখন বাড়ি ফিরবে জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি একটু ব্যস্ত হয়েছিলেন। তোমাদের ওদিকটাতে নাকি সন্ধের পর গণ্ডগোল হয়েছে। আমি বোধ হয় বোমের শব্দ পেয়েছিলাম।

—মা কখন খোঁজ করছিলেন?

—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। আমি বললাম, নালীক যা লাজুক, দেখুন কোনো ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে বই নিয়ে বসে আছে। শোণি একটু আগে বলল, নালীকদা, মা, কোণের ঘরটাতে একদম চুপ করে বসে আছে। আমি বললাম ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় না।

অকালে মাসিমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এর ওপর বসনও বিবর্ণের দিকে ন্যস্ত। সাদা বিদ্যুৎ, সাদা শামিয়ানা। কিন্তু সেই পরিণত রাতে সেই শ্বেত পটভূমিতে তাঁকে মনে হয়েছিল সার্থক সুন্দরী এবং নিরঞ্জনা। গতকালই তো, শ্রাদ্ধের আগের দিন, ঘরদোর পরিষ্কার করতে নেমেছিল দুই বোন। শোণিমা বনেদি কাঠের প্রাচীন ড্রেসিং টেবিলের

ওপর থেকে নেমে এসে দেরাজ টেনেছিল। এইসব দেরাজের অন্তত দুটিতে মেসোমশাই তাঁর কাগজপত্র রাখতেন। বহু কাগজপত্র বেরিয়ে আসছিল শোণিমার তৎপরতায়। আমি সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। যে ঘরে প্রাচীন এবং বিশাল ড্রেসিং টেবিল সেই ঘরের একটা জানলার খুব কাছে কদম তার ফুল আর ডালপালা নিয়ে বিরাজ করত—আমিও সেই স্থিতি দেখেছি। মাত্র এক রাতের ঝড়ে কী ভাবে লুটিয়ে পড়েছিল কদমের সারাংশ তা-ও দেখার সুযোগ হয়েছে। আর তখন দেখছিলাম বয়সে কম নয়, ঝড়ে অটুট, প্রথম শ্রেণীর সজীবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কদমের সেই প্রতিবেশী অশথকে। আমি একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিলাম অশথের ঝলমলে পাতার শেষদিকটা কতখানি একাগ্র। তখনই শোণিমা চেঁচিয়ে উঠেছিল—নালীকদা, ছাখো বাবার কবিতার খাতা পেয়েছি।—যিনি কবিতা না ছাপিয়ে কবিতা লিখে গেছেন তাঁর কবিতা তাঁর নিজেরই জন্য। নিশ্চয়ই সেই পরম ব্যক্তিগত খাতাটি বসে-বসে দেখার লোভ আমার থাকবে। সেই খাতা বাড়িতে নিয়ে আসার অধিকার পেয়েছি। প্রতিটি পাতায় তিনি লিখে রেখেছেন তাঁর ছন্দোবদ্ধ ভাব। একটিও সাদা পাতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। শুধু আমার এই ঘরে, পিসিমার এই ঘরে, রাত্রির এই ঘরে বসে পেয়েছিলাম সেই খাতা থেকে ঝরে পড়া মাসিমার এক লিপিসমষ্টি। স্বামীকে লেখা তাঁর সেই বহু পুরাতন পত্রের অক্ষর ভাসা-ভাসা। বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি অপেক্ষায় আছেন। সুসময়ের আশায় তিনি এই বিচ্ছেদ সহ্য করে যাচ্ছেন। তাঁর সন্তানেরা ছোটো-ছোটো। তাঁদের নিয়ে তিনি খুব বিব্রত। তাঁর ভালো লাগে না। এরপর প্রণাম জানিয়ে সর্বশেষে এসে গেছে তিনটি শব্দের একটি বাক্য—আমার চুম্বন নিও। মাসীমার হাসির মধ্য থেকে ঝরে পড়ছে সেই স্নিগ্ধ লিপ্তি। শোণিমা ছাদের মেঝেতে মায়ের পাশে বসে পড়েছে। অদূরে মুণ্ডিতমস্তক সুজনদা অপর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে কোনো একটা হিসেব বুঝে নিচ্ছে। তখনই তো টের পেলাম, অপর্ণার মধ্যে নেমে এসেছে মাসিমার অবিকল ঠাম। তাকে খুব সহজেই বলে ফেলা যায় অঙ্কুরিত মাসিমা। গত এক যুগ ধরে এখানে আসছি। প্রথমে সুজনদার সঙ্গে কিন্তু তার পরে একা-একা শত-সহস্রবার। কী ভয়ংকর পুরোনো ইমারত। দোতলার কোনো-কোনো অংশে অশথের কচি-কচি মুখ। সেই মুখ লক্ষ করেছি কতবার কতদিন। এসে-এসে দেখেছি ফ্রক ছেড়ে অপর্ণা আর শোণিমা কী ভাবে শাড়ির বহুবর্ণ উদারতায় চলে যেতে পেরেছে। ওদের সোফায় ব'সে কফির কাপ হাতে নিয়ে গল্প করতে-করতে হরিধনি শোনা যায় বারংবার, এই বাড়ির সামনের পথই মহাপ্রস্থানের পথ। কতদিন সুজনদার সঙ্গে তুষার আর গিরিরেখা নিয়ে কথা হয়েছে। সুজনদার অজস্র আরোহণের পর যেসব প্রত্যাবর্তন দুটির বৃত্তে ধরা পড়েছে সেইসব প্রত্যাবর্তন আমি লক্ষ করেছি। একবার তার অন্তত দুজন বন্ধু অভিযান শেষ করে যখন নেমে আসছে তখনই জয়ের অসতর্কতার ফল ফলে। অপর্ণাদের বাড়িতে বসে আমি সারা সকাল ধরে শুনেছিলাম সেই তুষারে ঝরে পড়ার বিবরণ। সুজনদা অকম্পিত গলায় দেখিয়ে দিয়েছিল অভিজ্ঞতা কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে। তখন হয়তো সেই বিবরণের অবসরে অপর্ণা একবার এসে সফেন কফি রেখে চলে গেছে। শোণিমা একাধিকবার এসে দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কলের জল যাবার সময় হল, স্নান করা দরকার। সুজনদা তুষারে যাদের চিরকালের জন্য রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের ছবি দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্নানঘরে চলে গেছে। আমি হয়তো পাঁচ মিনিট বই হাতে করে ব'সে আছি। তখনই মেসোমশাই বাজারের থলি রেখে আমার সামনে এসে বসেছেন। শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, বিপন্নতার কথাও একের পর এক এসে ভিড় করেছে।

—অপুকে কত বললাম বি.এ.-টা শেষ কর। সে কিছুতেই পরীক্ষায় বসবে না। এই তো পরশু থেকে

পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

—কেন, বসতে চাইছে না কেন?

—বলছে আমার গানের ফাইনাল সামনে। ওটা ভালো করে দিতে হবে। এর কী উত্তর দেবে বলো? বি.এ-টা শেষ করে গানের ফাইনালে বসা যায় না?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কোনো দিনও সহজ ছিল না। সেদিনও আমি নীরব থাকতে চেয়েছিলাম। তখনই ছাদের ঘর থেকে ভেসে আসছিল তানপুরার আশ্রয়ে সমৃদ্ধ অপর্ণা। আমি শুধু বলার মধ্যে বলেছিলাম—শোণিমা তো ভূগোলে অনার্স পড়ার সুযোগ পেল—আপনি তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

—তা ঠিক, তা ঠিক। যেখানে আশা করি নি সেখানেই হয়ে গেল।

মেসোমশাই জানতেন না, কিন্তু আমি জানতাম অপর্ণার বি. এ. না দেবার পেছনে গানের প্রভাব ছিল না, ছিল ভুবনের প্রভাব। জানার মধ্যে তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিল না। আমি ভুবনকে শত-সহস্রবার অপর্ণাদের বাড়িতে দেখেছি। সে মফসসল থেকে বাসে চেপে চলে আসত। তার হাতে থাকত এসরাজ। ভুবন অপর্ণাদের বাড়িতে চা খেয়ে গল্প করে এসরাজ নিয়ে উঠে যাচ্ছে এবং তাকে অনুসরণ করে অপর্ণা চটি পরছে এ-দৃশ্য দেখতে-দেখতে বহু পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। অপর্ণাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে গানের স্কুল। সেখানে অপর্ণা গলার এবং ভুবন যন্ত্রের চর্চা করত। তুমি এসরাজ বেছে নিলে কেন?—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ভুবনের উত্তর ছিল—এসরাজের চল খুব কমে যাচ্ছে। কেউ-কেউ না শিখলে একেবারে হারিয়ে যাবে।—শুনেছিলাম ওদের গানের স্কুলে একজনই বৃদ্ধ আছেন যিনি এসরাজ শেখান। তিনি ভুবনদের অঞ্চলেই থাকতেন। শোনা যায় ভুবনের বাবা গামছা পরে শহরে এসে চারতলা বাড়ির মালিক হয়েছেন। তবে কি তিনি এসরাজের শিক্ষককে বাড়িতে এনে ছেলেকে শেখানোর মধ্যে বিলাসিতা খুঁজে পেতেন? না কি ভুবনই এসরাজ বয়ে এনে স্কুলে বসে শেখার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল প্রাণ? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তত সহজ ছিল না। কিন্তু সহজেই পাওয়া যেত ভুবন-অপর্ণার সহাবস্থান। আমিও দেখেছি তৃণভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভুবন-অপর্ণা। তখন প্রায় দুপুর। কিংবা বিকেলে বাবা একদিন দেখে ফেললেন।—অপু দেখি একটা ছেলের সঙ্গে জলের পাড়ে গিয়ে বসল।—বাবা মাকে নিম্নস্বরে কথাটা বাড়ি ফিরে এসে বললেও আমার কানে এসেছিল। মা বিস্মিত না হয়ে বাবাকে বিস্মিত করতে চেয়েছিলেন।—এ তো তবু ভালো, জলের পাড়ে গিয়ে বসতে দেখেছ। সেদিন কাকে যেন বলতে শুনলাম, বিধুবাবুর বড়ো মেয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরোল। সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।

কখনও-কখনও এসরাজ অপর্ণাদের বাড়িতে রেখে যেত ভুবন। সুজনদা সেই ক্ষণিক আয়তন বুকে চেপে ধরে হাসতে-হাসতে ছড় টানত। মেসোমশাই বিশ্বাস থেকে বিপন্নতায় এবং বিপন্নতা থেকে বিশ্বাসে বারেবারে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর তেমন কোন সাধারণ দৃষ্টিপাত দানা বাঁধার অবসর পেত না। না হলে তিনিও আমার এবং আর সকলের মতো বুঝতে পারতেন তাঁর অপু কেন পড়ার রোদ্দুর থেকে গানের ছায়ায় ফিরতে চেয়েছিল নির্দ্বিধায়। মেসোমশাই লোক বেছে-বেছে কথা বলতেন এবং কথা বলতে-বলতে থেমে যেতেন। যেন যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা বলার আদৌ কোনো অর্থ আছে কিনা এমন কোনো প্রশ্ন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভুবন তাঁর বাছাই-তালিকায় নাম ওঠাতে পারে নি। আমি কোনদিনও দেখি নি, মেসোমশাই একা ব'সে ভুবনের সঙ্গে বিস্তৃত।

একদিন সকালে বাইরের ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। সুজনদা শহরে থাকলে এই সময় এই ঘরেই থাকে। কাগজ হাতে ধরে আপাদমস্তক পাঠ করার ধৈর্য তার আজও যথেষ্ট আছে। সে ঠিক

খুঁজে-খুঁজে বের করে এমন সব খবর যেগুলির মধ্যে সদ্যঃপাতী শিশিরের গন্ধ। হয়তো সপ্তাহে একটাই তার অনুসন্ধানের ফলরূপে জমা পড়ে। কিন্তু এই বিপুল জাঁকজমকের মাঝখানে সেইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছের হাত ধরে কখনও-কখনও চলে যাওয়া যায় পৃথিবীর প্রকৃত প্রত্যূষগুলিতে, সুজনদার একথা না মেনে উপায় নেই। কেউ ঘরে না থাকলেও আমি বসে পড়ি। টেবিল জুড়ে তিন-চারটি দৈনিক আর সাপ্তাহিক। কদমগাছ লুটিয়ে পড়ার পর খোলা জানলা দিয়ে ঘরে আলো লুটিয়ে পড়ার কোনো বিরাম নেই। সেদিনও ছিল না। দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সত্যিই বাস্তববাদী। নাহলে নক্ষত্রের প্রভাব নিয়ে নিয়মিত ভাবে কিছু না কিছু বলার জন্য জায়গা ছাড়ত না। আমার অভ্যাস আছে কাগজ পেলে নক্ষত্র বিষয়ক জায়গাটি একবার উলটে দেখে নেবার। এ-সব উলটে দেখে নিতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যেও কোনো জনপ্রাণী দেখতে পাই নি। শেষে যখন দেয়াল-তাকের পরদা সরিয়ে বই দেখছি, পরিচিত বইগুলির পরিচিত স্তরের ফাঁকে কোনো অপরিচিত গ্রন্থ ঢুকে আছে কিনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি, তখনই তো প্রথম মানুষের পদশব্দ পেলাম।—কী খবর শোণিমা? কাউকে দেখছি না?

—আমরা কোণের ঘরে ছিলাম। তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—এই কিছুক্ষণ আগে। সুজনদার ফিরতে তো এখনও দেরি আছে?

—না, তাড়াতাড়ি ফিরবে। দাদা তো এবার অফিসের কাজে গেছে।

—অপর্ণা কোথায়? ওকে মনে হচ্ছে আগের দিনও দেখি নি।

শোণিমার উত্তর দিতে দেরি হচ্ছিল। যেন সে কী ভাবে বলবে তা ঠিক করে উঠতে পারছে না। আমিও তার অস্বস্তি দেখে ও প্রসঙ্গ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলাম।

—কফি আছে তো? থাকলে কফি করো।

—আমি কফি করে আনছি। তারপর তোমাকে একটা কথা বলব।

চায়ের কথা থাক। তা এতদিন ধরে মাসিমা, শোণিমা এবং অপর্ণা এই তিনজনের মধ্যে যে-কোনো একজন তৈরি করে আমাকে দিয়েছে। কখনও-কখনও সুজনদার দ্বারাও চা হয়ে আমার হাতে পৌঁছেছে। কফির বেলায় হিসেবটা কিন্তু অন্যরকম। আজ পর্যন্ত যতবার এ বাড়িতে কফি খেয়েছি ততবার না হলেও প্রায় ততবার অপর্ণাকেই কফি বানাতে দেখা গেছে। তার হাতেই প্রথম আমি ফেনিল কফি দেখেছিলাম। অনতিদূরের একটা বাড়ির অধিকারে যে গাছটা পড়ে গেছে তার শরীরে বেল ঝুলছে। না কি বলব বহু ঝুলন্ত বেল মিলে তার শরীর হয়ে উঠেছে। মানুষের উপকারী বেল মানুষের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটোদের এই বেলগাছ দেখিয়ে কত শত ভয় দেখানো হয়ে গেছে। সেই যে মুণ্ডিতমস্তক এক বিপ্র খড়ম পায়ে দিয়ে বেলগাছ আগলে রাখেন সারা রাত। তিনি কোথায়? অপর্ণারা বহু বছর ধরে এই বাড়িতে আছে। অপর্ণা কি ছেলেবেলায় খুবই দুরন্ত ছিল? হয়তো শোণিমার মতো শান্ত ছিল আর শোণিমাই ছিল দুরন্ত। মাসিমা কি তাদের ঘুমোনোর আগে খোলা জানলার পাশে বসে ঘুম আনতে যান নি? আনতে গিয়ে তাঁর কথা ব'লে ওঠেন নি যিনি মাথা কামিয়ে পৈতে নিয়ে খড়ম পায়ে বেলগাছ থেকে নেমে আসেন? তবে তো বেল আরও কত সাহায্য করল। ঘুম আনার পথ করে দিল। অপর্ণাদের বাড়ির পুজোয় একশো আটটি পাতা লাগে। সেও কিন্তু ওই বিল্বপত্র। আর শ্রীফল শুধু তো উপকারী নয়, সুঠাম সেইসঙ্গে। গোল, দৃঢ় এবং সারবান। শোণিমা কফি নিয়ে ঢুকলে সেই স্তব্ধ ঘরে বসে মনে হয়েছিল অপর্ণা বিল্বস্তনী।

—একটু দেরি হল, নালীকদা। স্টোভ খালি ছিল না। আতপ চালের ভাত বসানো ছিল।

শোণিমা কফি দিয়ে উলটো দিকে বসল। শাড়ির কোণ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে তার চেষ্টা ছিল কী ক'রে কথায় ফিরে আসা যায়। এইসব মুহূর্ত বড়ো মূল্যবান। একজন যৌবনবতী ভাবছে কী ভাবে কথা বলবে।

—শোণিমা, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করব?

—কী সাহায্য?

—তুমি যে কিছু একটা বলতে গিয়ে পারছ না সেই ব্যাপারে সাহায্য?

—না, তা ঠিক নয়, তবে ভাবছি কেন এমন হয়?

—তোমার দিদির কিছু হয়েছে?

—দিদি তো ভেতরের ঘরে শুয়ে আছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

—কেন, হয়েছে কী? অবশ্য যদি কোনো অসুবিধে না থাকে।

—যা হবার তাই হয়েছে। দিদি ভুবনদার সঙ্গে এই প্রথম তাদের বাড়ি গিয়েছিল। ভুবনদা তার মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সেদিন ফিরে এসে দিদির যে কী উচ্ছ্বাস। কত বড়ো বাড়ি। কত ভালো বাড়ি। সবাই কত ভালো। ঠিক তার পরদিন ভুবনদা এল। এসরাজটি নিয়ে চলে যাবার সময় দিদিকে বলল—মা বলেছেন, মেয়েটির রঙ বড়ো চাপা। আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত এত চাপা রঙ আসে নি। দিদির এখন থেকে-থেকে একটাই কথা—আমি কী ভুল করেছি! দাদাও নেই যে তাকে কিছু বোঝাবে।

—শোণিমা, তোমার দিদিকে যদি ডাকি, আসবে?

—এখন? মাথা খারাপ, উঠবেই না। বললাম না শয্যাশায়ী।

আমি যে অপর্ণাকে ডেকে আনার কথা কেন তুলেছিলাম তা আজও জানি না। ডাকলে যদি সে সত্যিই উঠে আসত কী আমি তাকে বলতে পারতাম? কিছুই বলতে পারতাম না। মনে-মনে হয়তো কিছু কথা বুনে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেগুলো মন থেকে বের করে দিলে সব সময় শুনতে তেমন ভালো লাগে না। 'কী ভুল করেছি'—এই আক্ষেপ শুনে হঠাৎ রামায়ণের কথা মনে হয়েছিল। রামায়ণ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটা ভুলের ওপর। সে ভুল দশরথের। দশরথ সেই ভুলটা না করলে রামই বা কোথায়, রামায়ণই বা কী। কী সেই ভুল? মৃগয়ায় গিয়ে তিনি অন্ধমুনিতনয়কে হরিণ ভেবেছিলেন। ফলে শরযোজনা। ফলে মুনিপুত্রের মৃত্যু। আর তার ধাক্কায় অন্ধমুনির অভিশাপ—দশরথও পুত্রশোকে শেষ হয়ে যাবেন। অভিশাপ ফলাতে পুত্রহীনের পুত্র হল, রাম এলেন এবং এল সাতকাণ্ড রামায়ণ। তাই ভুলের মূল্য আছে। এসব হাঁটতে-হাঁটতে ভাবা যায়, ভাবতে-ভাবতে নিজের কাছে নিজেকে পরিষ্কার করে তোলা যায়, পাওয়া যায় সন্তাপের যুক্তি, কিন্তু জানানো যায় না শয্যাশায়ী নারীকে ডেকে এনে। আমি সেদিন শোণিমাকে কিছুই বলতে পারি নি। ওকে একটু একা থাকতে দিও।—উঠে আসার আগে আমার অন্য কোন কথা অনুচ্চারিত ছিল।

ওই শ্রুতির পর বেশ কিছুদিন অপর্ণাদের বাড়িতে আমি যেতে পারি নি, যেতে চাই নি। এমন কিছু-কিছু ঘটনা আছে যেগুলির সঙ্গে নিজের কোনো-রকম সম্পর্ক না থাকলেও বারেবারে সেগুলির দায়-ভাগ গোপনে-গোপনে যেন নিজের পরেও কিছুটা এসে পড়ে। ওই ঘটনাটি, ওই বিছানা জুড়ে দিবা-লোকেও শুয়ে থাকার ঘটনাটি, ওই এক যুবতীর মুখ থেকে অন্য যুবতীর পরাজয়ের ঘটনাটি আমার ত্রি-সীমানায় না ঘটলেও আমি আমার দায়িত্ব এড়াতে পারি না। কী সেই দায়িত্ব জানি না, কেউ আমাকে জেনে নিয়ে বলে দিতেও পারবে না, কিন্তু এক গোপন অস্বস্তি আমাকে ওই বাড়ির দিকের পথ থেকে অন্য সব পথে নিয়ে গিয়েছিল। যেসব বাড়িতে বহুদিন ধরে যাবার কোন ইচ্ছে হয় নি অন্য সব পথ ধ'রে সে

সব বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ানো ধূমপানের সমপরিমাণ এক নেশায় পরিণত হয়েছিল। কৈশোরে যেসব ভবনের মধ্য দিয়ে আমাদের লুকোচুরির বীথি গঠিত হয়েছিল, গঠিত হয়েছিল কিছু বিকেলমণ্ডিত সন্ধ্যা সেইসব ভবনের অনেকেই আজ ঠিকানা পালটেছে। তবু যারা-যারা আছে নতমস্তকে তাদের দরজায় উপস্থিত হওয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম এক অপূর্ব প্রায়শ্চিত্তের কাজ। এক ধোপা তার পরিবার নিয়ে বহুদিন হল প্রায় প্রতিবেশী। আমাদের বাল্য-কৈশোরে তার হরিণ ছিল। তার মাতৃভাষায় হরিণ মানে হিরণ। আমাদের দলবদ্ধ বন্ধুরা সেই চিত্রিত-গাত্র হরিণের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যা-যা করা দরকার সবই করে যেত অম্লান ভঙ্গিতে। ছুটে আসত রজকদুহিতা। বাধা দিত আমাদের এবং বোঝাত হিরণকে কষ্ট দিলে হিরণ ওপরে চলে যাবে। হিরণ একদিন সত্যিই ওপরে চলে গেছে। আজ তাকে সে-যুগের স্বর্ণমৃগ ভেবে নিতে আমার কোনো বাধাই আর দাঁড়াতে পারে না। হরিণের স্মৃতি নিয়ে সেই ধোপাদের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতাম।—কী নালীকবাবু, আপনি? বহুদিন পরে এলেন?

—হ্যাঁ রামু, অনেকদিন পরে এলাম। তুমি ভালো আছ তো?

—এই আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাচ্ছে।

রজতদুহিতাকে দেখতে পাই নি। প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করে নি। জানি তো প্রশ্ন করলে বহু দূরে কোথাও তার স্বামী ও সংসারের তৈলচিত্র পাব। রামু ঠেলা বোঝাই করে কাপড়-জামা দিয়ে এবং মাঝে-মাঝে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে জলের মাঠ আছে, জলের ঘাট আছে, হাওয়া আছে, আছে রৌদ্রবিকাশ। আগে তো মেয়েকে ঘরে রেখে, হরিণের কাছে রেখে রামুর সস্ত্রীক যাত্রা ছিল। পরে কী করত রামু আমার ইচ্ছে থাকলেও তা জিজ্ঞেস করি নি। কোনো এক বিপন্ন সিঁড়িতে উঠে ডেকে উঠতাম—প্রফুল্লদা আছ?—সাড়া দিত কুকুরেরা প্রথমে, তারপর প্রফুল্লদা,—কে এলি রে?

—আমি নালীক, প্রফুল্লদা। তোমার কুকুর সামলাও।

অনিরুদ্ধ দরজা দিয়ে তিনটি কুকুরের সঙ্গে প্রফুল্লদার বহিঃপ্রকাশ।

—আরে কুকুর কিছু করবে না, ভয় নেই। তুই তালে বেঁচে আছিস। কুকুরই প্রফুল্লদার নিত্য সঙ্গী। হোটেলে খেতে যাচ্ছেন, পেছনে যাচ্ছে তিন সারমেয়। যখন অনুষ্ঠানে বাজাতে যেতেন অনুষ্ঠানকেন্দ্র যদি বাড়ির কাছে হত, মণ্ডপের বাইরে ফুটপাথে অপেক্ষা করত ত্রয়ী। প্রফুল্লদার তপোমূর্তি দেখা যেত না, তা ছিল অনুভবের বস্তু। এই টাকডুরা, ফতুয়া ও পাজামাধারী প্রবীণ যখন মঞ্চে উঠে মাউথ-অর্গানে আনতেন বিমান অবতরণের শব্দ, কিংবা যুদ্ধসঙ্গীত কিংবা রাজহংসের জলতান অসংখ্য হাত থেকে অভি-নন্দনের শব্দ উঠত।

—দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়, কুকুর কিছু করবে না।

—তুমি ভালো আছ প্রফুল্লদা? তোমাকে অনেকদিন দেখি নি। শুনেছিলাম গলা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ। এখন কেমন আছ।

—আমি খুব ভালো আছি। আমি কোনদিনও খারাপ থাকি না। লালুটা মাঝে খুব ভুগে উঠল। অনেকগুলো ইঞ্জেকশান দিতে হয়েছে। ভেতরে যাই নি। প্রফুল্লদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই অনেক কথা হয়েছিল। মুখে তিনি অনেক নতুন ঝংকার এনেছেন। চলে আসার আগেও বলতে সাহস হয় নি, প্রত্যাখ্যাত নারী বিছানায় পড়ে আছে, তার শব্দ তুলেছ?

আমার এই অনুপস্থিতির অবসরে, আমার এই পরিভ্রমণের পর্বে আমি একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে আসছি। পোস্ট অফিসের পরিচিত ছেলেটি হাতে তুলে দিল শেষ ডাক।—নালীক, বাড়ি ফিরে অপুকে দেখলাম। দেরি না করে অপুকে নিয়ে বেরিয়ে

পড়েছি।—সুজনদার চিঠির শুরুটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। সুজনদা প্রভুত নিসর্গের মধ্য থেকে চিঠি দিয়েছিল। সেবার তার যাত্রায় ছিল ভ্রমণের নিরাপত্তা। অপুকে নিয়ে সুগম পাহাড়ি পথে শুধু ঘুরে বেড়ানো। সেবার কোন শিখরের দিকে তাকিয়ে কোন মৃত্যুময় আরোহণ নয়। এরই মধ্যে খবর ছিল। শীত অগ্রাহ্য করে এক পূজারির অনুরোধে তাঁর তানপুরা নিয়ে অপু একদিন বসেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে তার ভজন শুনে, তার মাথায় নেমে এসেছিল পূজারীর আঙুল। আর মনে আছে চিঠির সর্বশেষ বাক্য—আমাদের ফেরার দিন এখনও স্থির হয় নি। ফেরার দিন তখনও অনির্দিষ্ট জেনে আমি অনেকদিন বাদে সুজনদার বাড়ির পথ ধরেছিলাম। পথ থেকে দেখা যায় পুরোনো ছাদে নতুন বুক ঠেকিয়ে শোণিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো এই সময় অনেক কিছু লক্ষ করে। সে নিশ্চয়ই দেখতে পায় গঙ্গার ওপারের মন্দিরের চূড়া এখনও কত শিল্পগত। অদূরের আকাশে যেসব পাখি উড়ছে তারা ঊর্ধ্বে যতই মহিমার অংশ হোক সেতুর ওপরে বা নীচে নেমে এলে দেখা যায় তারা আদতে শকুন। ভেঙে-পড়া এবং প্রাচীন সব গৃহমণ্ডলীর অনন্ত সমষ্টির এক কোণ দিয়ে কী ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে বহুতল ইমারত। এরই মাঝে কোনো-কোনো জনপদের হৃদয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা নারকেলগাছ তার পাতাকে বাতাসের আকস্মিক ধারায় ডুবিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শোণিমা নিশ্চয়ই জানে নিশ্চয়ই দেখেছে সমস্ত কিছুকে যা ছন্দোবদ্ধ করে রেখেছে তা চিমনির অবিরাম এবং নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাস এত ঊর্ধ্বগামী, এত তামসিক হতে পারে? আর সেই বিকেলেও অঞ্চলের আকাশ এমন সব মেঘকে ধারণ করেছিল যারা মূলে প্রশান্ত, যারা নতুন বুকের যুবতী-গুচ্ছকে পুরোনো সব কল্পনায় ভরিয়ে রাখতে পারে। ছাদ থেকে পথের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা গেলেও ছাদের মানুষেরা যতটা সজাগ থাকলে সব কিছু দেখা যায় ততটা জাগ্রত থাকে না। মাটি থেকে খানিকটা ওপরে উঠলেই চোখের মধ্যে এসে যায় ভাবনার পাখা। তখন যা দেখছি তা কোনো পূর্বাপর দেখা নয়। কোনো কোণ দেখা, তার কোনো ভাবনাকে দেখা। ছাদে দাঁড়িয়ে শোণিমারা পথের পাশের কোনো ঘর দেখে, ঘরের পাশের কোনো ঘর দেখে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা কোনো মানুষের চলে যাওয়া দেখে। কখনও দেখে গভীর মণ্ডপ, কখনও দেখে দেহাতি বিবাহ তথা গ্রাম। আর দেখে শব ও তার বাহকবর্গ। হরিজনদের শববিষয়ক যত বাজনার আকৃতি। কদাচিৎ, হয়তো সমগ্র যৌবনে দু-একবার, হাতি বা উটের নিঃশব্দ হেঁটে যাওয়া। শোণিমাকে বলা হয় নি যে পাহাড় স্থির থাকে, কিন্তু উট চলে যায়—এই মর্মে আরমেনিয়ার একটি গল্প আমি ওই ছাদে বসেই পড়ে ফেলেছিলাম। সেই বিকেলে আমি যখন সুজনদাদের বাড়ির গলিতে ঢুকছি তখন শোণিমার চোখ পথের অন্যদিকে ছিল। সেখানে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠ থেকে অশ্বারোহী নেমে ঘোড়ার কিছু একটা দেখে নিচ্ছিল। প্রতিযোগিতার মাঠ আমাদের খুবই কাছে।

সুজনদা নেই, অপর্ণা নেই। বাড়ি নিশ্চয়ই নিঃশব্দ হয়ে থাকবে। একতলার ছেলেরা গলিতে বল খেলতে প্রস্তুত হচ্ছে। ওই আসন্ন কলরোল কি আসীন নৈঃশব্দ্যকে মুছে দিতে পারবে? নৈঃশব্দ্য তো নিশ্চয়ই। শোণিমা ছাদে স্থির। আর দোতলার ঘরগুলিতে মাসিমা মেসোমশাই। আমার উপস্থিতিতে খুব একটা দাম্পত্যবাক্য কোনোদিনও দেখি নি। বিকেল তো, মাসিমা নিশ্চয়ই উঠে ঠিকে ঝিকে লক্ষ করছেন। মেসোমশাই দুপুরে ঘুমোনোর যে অভ্যাস তার মধ্যে না গিয়ে জানলা পরিপূর্ণভাবে খুলে দিয়ে স্থির হয়ে এবং গ্রন্থহীন হয়ে যদি বসে থাকার চেষ্টা করেন তবেই সেটা স্বাভাবিকতা হবে। এতদিন বাদে হঠাৎ গিয়ে দোতলায় দাঁড়ানো অস্বস্তিকর। তার চেয়ে ভালো না থেমে একেবারে ছাদে উঠে যাওয়া। আমি সেই প্রথম দোতলায় না থেমে ছাদে গিয়ে দাঁড়ানোর মনোবল পেয়েছিলাম।

পেছন থেকে পা টিপে-টিপে গিয়ে রমণীকে ভয় দেখানোর প্রলোভন বহু পুরোনো। আমি সেই প্রলোভন জয় করতে পারব এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। ফলে আমি শোণিগাঢ় ঠামের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—কী শোণিমা, অত ঝুঁকে পড়েছ কেন?

শোণিমা চমকে গিয়ে পাঁচিল ছেড়ে দিয়ে ফিরে তাকাল।—নালীকদা, তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে? কালও মার সঙ্গে তোমার কথা হচ্ছিল।

—কেন, আমি বাড়িতেই ছিলাম। কোথাও চলে যাই নি তো।

—তবে এতদিন আস নি কেন? আমরা কী দোষ করলাম?

—মাঝে-মাঝে না এলে আসাটা যে কত প্রয়োজনের তা বোঝা যায়।

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

এই প্রশ্ন করে শোণিমা খুবই স্বাভাবিক একটা কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমি চট করে বলে ফেলতে পারলাম না যে আমি দোতলায় না থেমে সোজা চলে এসেছি এই বিকেলের ছাদে। শোণিমা ছাদে নির্লোক ছিল। তাই সব কথা বলা যায় না। রমণীর কাছে রমণীয় হওয়া সহজ, সহজ হওয়া যে কঠিন এ আমি ভালো করে বুঝে গেছি। আমার রবহীনতা দেখে শোণিমা আবার সেই প্রশ্ন করল—মার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি? মা তো ঘুম থেকে উঠে গেছে। আমি যখন ছাদে আসি মা টিয়াকে গম দিচ্ছিল।

—রাস্তা থেকে দেখলাম তুমি অনেকটা ঝুঁকে পড়েছ। পুরোনো বাড়ি পুরোনো ছাদ। দেয়ালের ভেতর দিয়ে অশথের পাতা বেরিয়ে আসছে। তোমাকে সাবধান করার খুবই প্রয়োজন ছিল। দেরি না করে তাই সোজা ছাদে চলে এসে তোমাকে ডাকলাম।

শোণিমা এপাড়ায় সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজে সিদ্ধি লাভ করেছে, এ মন্তব্য অমূলক নয়। জানি না আমার এই উত্তর তার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। সে শুধু বলতে পেরেছিল—চলো নীচে যাই।

—এখন আর নামতে ইচ্ছে করছে না। একটু ছাদে বসি। একটা ছাদ থাকা মানে অনেক কিছু থাকা। তুমি যদি একটা মাদুর আনতে পার ভালো হয়। শোণিমা স্বেচ্ছায় কিংবা ছুটে-ছুটে মাদুর আনতে চলে গিয়েছিল এ বললে সত্য থেকে সরে আসা হবে। এ বাড়িতে প্রথম দিনে তার যে লজ্জা দেখেছিলাম তা কয়েক বছরে আগত যৌবনভারে এখন আর ঠিক সেই লজ্জা নেই, তা যেন পরিশোধিত হতে-হতে বুদ্ধির সংমিশ্রণে একটি নিজস্ব গোপনতায় মিশে গেছে। মাদুর আনতে যাবার আগে সে অন্তত দু মিনিট ছাদের পাঁচিলে তার সমস্ত ভার রেখে দাঁড়িয়েছিল। আর মনে পড়ে অদূরের কোনো কারখানার ভিতর থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল সাইরেন।

বিকেলের ছাদের মধ্যে চিরকালের কোনো কথা ঘুরে বেড়ায় না। বরং সাম্প্রতিক আরও একটু প্রসারিত হয়ে আরও একটু সহনীয় হয়ে যায়। পথ দিয়ে আসতে-আসতে ধুলো, ধোঁয়া, গরিমা আর গ্লানির যেসব তাপ শরীরে মিশে যায় বিকেলের ছাদে সামান্য অবস্থিতির ফলে সেসবের জ্বালা আর থাকে না। কত দিন পরে বিকেলের ছাদে এমন এক বিজনতা পেলাম যা স্বল্পায়ু জেনে বড়ো ভালো লাগে? বহুদিন পরে আমি ছাদে হাঁটছি, কোনো লোক নেই, কোনো কথা নেই। কিন্তু লোক আসবে, কথা শুরু হবে, এমন এক প্রতিশ্রুতি আছে, ইঙ্গিত আছে। ইঙ্গিত সম্বল করে ইতিউতি হেঁটে বেড়ানো সেদিনের সার্থকতা ছিল। ছাদ আছে, ছাদে ঘরও আছে। ওই ঘর প্রতি-দিন সকালে ধুয়ে ফেলা হয়। কখনও মাসিমা, কখনও শোণিমা, কখনও-কখনও অপর্ণা নিজেদের হাতে ওই ঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে। ওই ঘরে প্রতিদিন সম্পদশালী ধূপকাঠি জ্বলে ওঠে। তার আগে কয়েকটি পট, দু-একটা মারবেল পাথরের মূর্তি কমলা রঙের

কাপড় দিয়ে করতলে রেখে সুমার্জিত করা হয়। তারপর হাতের তেলোতে সেনট ঢেলে সেই পট আর মারবেল পাথরে সেনট মাখানোর কাজ। এই কাজ প্রতিদিন করে দিয়ে যায় মাসিমা বা শোণিমা বা অপর্ণার সকালের অঙ্গুলি। আমি দেখেছি অনামিকার পৃথক ভূমিকা থাকে, মধ্যমার পৃথক ভূমিকা থাকে, তর্জনীর পৃথক ভূমিকা থাকে এবং থাকে অনামিকা-মধ্যমা-তর্জনীর সম্মিলিত প্রতিপত্তি। ওই ঘরে মাঝে-মাঝে এক বৃদ্ধের দ্বারা হোমাগ্নি জ্বলে ওঠে। তখন মাসিমা শোণিমা অপর্ণা এই তিনজনের যে-কোনো একজন দোতলা থেকে ঘিয়ের শিশি নিয়ে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিলে ঘৃতাহুতি হয়। একশো আটটি বিল্বপত্র তিনজনে বেছে-বেছে সরিয়ে রাখলে সেই সংকলনে বৃদ্ধের হাত গিয়ে পৌঁছয়। আর ধোঁয়া হয়, তাপ হয়, অস্থিরতা আসে। সর্বশেষে বৃদ্ধ প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে যখন হোমের টিপ পরিয়ে দেন তখন কপালের সেইসব কালো দাগের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি সুন্দর এসে পড়ে, তাকে ডেকে আনা যায় না। কপালের সেইসব ছোটো-ছোটো কৃষ্ণচক্র নিয়ে শোণিমারা শান্ত হয়ে বসে পড়ে না। তারা একবার দোতলায় নেমে যায়, একবার উঠে আসে। একজন হালুয়ার থালা হাতে করে নেমে গেল, একজন শূন্য থালা নিয়ে উঠে এল লুচি নিয়ে যাবে বলে। এই অবিরাম যাতায়াত রাতের কোনো এক বাঁকে এসে নিশ্চয়ই থেমে যায়। কিন্তু তখনও থাকে সেই ছোটো-ছোটো কৃষ্ণচক্র। সেই কৃষ্ণচক্র নিয়ে শোণিমারা শয্যাশায়ী হয়। ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমেরও কিছু-কিছু নিজস্ব বিস্তার আছে। তার দ্বারা চক্রের কিছু অবলুপ্তি ঘটে। পরের দিন সকালে সেই অস্পষ্ট চক্র আমি দেখেছি। নারীর কপালের সেইসব দাগ দেখে নীরবতা হত।

শোণিমা মাদুর না এনে এনেছিল শতরনজি। ছাদের কিছুটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে তবে শতরনজি পাতা হল।—নালীকদা বোসো। এই বইটায় একটু চোখ বুলোও। আমার এবারের জন্মদিনে দাদা বইটা দিয়েছে। যা গরম পড়েছে আমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।

শোণিমা জানে বিকেলের ছাদে বসার জায়গা পেলে হাতে বই না থাকলেও আমার সময় কেটে যায়। শোণিমা জানে আমি এই বিজনতাগুলিকে সজনতার পূর্বাবস্থা বলে মানি। হাত পেতে যে বইটি নিয়েছিলাম তা বিদেশী বই। আকারে ছোটো। তবে শ্যাম এবং সুপর্ণ। নারীর ইতিহাস পাওয়া যাবে, নামে এই নিশ্চয়তা আছে। বই যেমন-তেমন করে উলটে মধু সংগ্রহ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। আমার অভিজ্ঞতায় এমন মাঝে-মাঝে ঘটে গেছে। সেই বিশ্বাস নিয়ে শোণিমা পরিমার্জিত হয়ে ফিরে আসার আগেই পাতা ওল্টানোর কাজে নেমেছিলাম। বন্য মানুষদের মধ্যে অবিবাহিত এবং অনুর্বর নারীদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। সেইসব বিবাহনির্ভর সমাজে মেয়ে যখন শরীরসচেতন হয় তখন সেই বাগ্‌দত্তাকে তার পুরুষ পুঁতির মালা দিয়ে জড়ানো কাঠের পুতুল দিয়ে যায়। দু-তিন মাস বাদে সেই পুরুষ অস্থির হয়ে পড়ে। বলে ওঠে—'আমি চাই আমার বউ বিছানার ভেতর থেকে উঠে আসুক।' তখনই তো সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। অন্তিম প্রস্তুতি শুরু হয়। কোনো এক বর্ষীয়সী এসে মেয়েকে নানা উপদেশে সমৃদ্ধ করে।—অতিথিদের সেবা করবে, শাশুড়ি কোনো কাজের ভার দিলে তা তাড়াতাড়ি বুঝে নেবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, স্বামীকে মানবে আর রান্নায় নিখুঁত হবে।—উপদেশের পরে বিয়ের আচারোৎসব শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে বৃষহত্যা, উপহারপ্রদান, গান, নাচ এবং খাওয়া-দাওয়া। তারপর মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হবে আসন্ন স্বামীর বাড়িতে। যাবার পথে তার পা যেন ভূমি স্পর্শ না করে। গ্রাম যতই দূরের হোক সে বাহিত হয়ে যাবে। যখন সে পৌঁছবে তার সঙ্গিনীরা চিৎকার করে উঠবে। সেই চিৎকার শুনে বর ছুটে পালিয়ে লুকিয়ে পড়বে

কোথাও। সে যে তার সামনের অপরিচিতাকে ভয় পায়। সে যে বিশ্বাস করে বিবাহের রাতে দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে। নারীর সেই মায়াবী ক্ষেত্রকে স্পর্শ করলে এমন-কি তার মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। সেই কারণে নারীর সঙ্গে প্রথম রাত সরলভাবে অতিবাহিত করে স্বামীর সম্পর্কিত কোনো তরুণ। বলা হয়ে থাকে যে এই নিরামিষ রাত্রিবাসের দ্বারা সে বিবাহকে ভক্ষণ করে ফেলে। আদতে সে পাত্রীর মধ্যে দিয়ে দেয় এক গুহ্য উজ্জ্বলতা যার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তার পরের দিন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় নির্বিচারে। প্রথম রাত্রির সেইসব মূক তরুণের সংখ্যা শুধু কি বনেই আবদ্ধ? বিকেলের নির্বন জগতে এই প্রশ্ন প্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রিয় হয়ে উঠেছিল সেবারের আগের বারে শোণিমার জন্মদিনে সুজনদার দেওয়া ভারতীয় সর্প-বিষয়ক বইটি। সে বইটিও আমি নিজে দেখি নি, শোণিমাই দেখিয়েছিল। তবে ছাদে নয়, রাত্রির দোতলায় বাইরের ঘরে। সে বইটিতে নাগপঞ্চমী থেকে শুরু করে সর্পপ্রধান নানা উৎসবের কথা ছিল। সাপের বিষ কী ভাবে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে তার সব ছবি ছিল। নানা সাপের ডিম পাশাপাশি সাজিয়ে একটি ডিম্বরেখা—তাও ছিল পরিষ্কারভাবে। ওখানেই তো ভীরু সাপের কথা পেয়েছিলাম। তারা লুকিয়ে থাকে প্রায়ই। বাইরের দিকে এদের কৃষ্ণ দাগ আছে। মফসসলে বাড়ির বাগানে এদের প্রবেশ ঘটে যেতে পারে। তা হলেও এরা প্রায় শব্দ না করে এক সময় মিলিয়ে যায়।

শোণিমা যে ফিরে এসেছে তা টের পেলাম কাপ রাখার শব্দে। সেদিন ফেনাঢাকা কফি পাই নি। শোণিমা শতরনজির এক কোণে বসতে গিয়ে বলে ফেলেছিল—দাদা না থাকলে কফিটা বাড়িতে খুব একটা চলে না। দাদাও নেই, কফি যে নেই সে খেয়ালও কারও নেই। কাল ঠিক আনিয়ে রাখব। আজ তুমি চা খাও।

শোণিমা সাজে নি, কিন্তু সুস্থ হয়ে এসেছে। সে প্রমাণ সর্বাঙ্গে ছিল। কোনো-কোনো মেয়ে বোধ হয় পেরে যায়। এই দেখা গেল আবদ্ধ আর বর্ণচ্যুত। হয়তো সামান্য বিরতির পর আত্মবিশ্বাসী আর নীল হয়ে উঠল। আমরা এমনভাবে বসতে পেরেছিলাম যাতে অন্তত প্রতীচীর আদ্যন্ত দেখা যায়। শকুনেরা ঘুরে-ঘুরে একটা দিক আবৃত করে রেখে যাচ্ছে। ওই দিকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নল এবং নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে শর্বরী থোকা-থোকা। আমাদের দুজনের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে বহু উচ্চতায় পাখিদের একটি মালা মিলিয়ে যেতে গিয়ে যে নির্মাল্যের সূচনা করে শোণিমা কি সেই সূত্রে কথা বলেছিল।—তুমি নাগলিঙ্গম ফুল দেখেছ?

—দেখা তো দূরের কথা এই প্রথম নাম শুনলাম। কেন বলো তো?

—আমাদের ক্লাসের সুতপা আজ নাম করছিল। রাজভবনের সামনে নাকি নাগলিঙ্গমের গাছ আছে। খুব সুন্দর নাকি এর ফুল। ফুলের গন্ধও নাকি অসাধারণ। আর-একটা কথা বলল সুতপা। ফুলের স্তবক কোথা থেকে বেরোয় বলো তো?

—ভালো লোককে জিজ্ঞেস করেছ। আমি এ-সব ব্যাপারে মহামূর্খ।

—কাণ্ডের শরীর ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরিয়ে আসে। ভাবছি দিদি ফিরে এলে একদিন দুজনে মিলে নাগলিঙ্গম দেখে আসব। তুমি কি জান দিদি এখানে নেই? দাদা এবার দিদিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে।

—জানি। সুজনদার চিঠি পেয়েছি। আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি আমরা বাড়ির ছাদে বসে আছি, আর ওরা পৃথিবীর ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার বন্ধু সুতপা কোথায় থাকে? এইসব অঞ্চলে?

—না না, এখান থেকে অনেক দূরে থাকে। ওর বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট খুবই কাছে। কেন বলো তো? ওকে কিছু বলতে হবে?

—যদি ভুলে না যাও একটা কথা জিজ্ঞেস

কোরো। ও কি নিজে, মানে স্বচক্ষে, নাগলিঙ্গম দেখেছে, নাকি শুনে এসে তোমাকে বলেছে।

—ঠিক বলেছ তো! ফুলের গুণপনা শুনতে গিয়ে এই কথাটাই আর জেনে নেওয়া হয় নি।

আমাদের সংলাপের মাঝখানে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। ছাদে যদি সন্ধে হয় তবে পৃথিবীর সন্ধ্যা থেকে যত গুহ্য উজ্জ্বলতা উঠে আসে। দূরে বহুতল ইমারতের অসংখ্য খোপে আলোর খোঁপা। পথ দিয়ে তখন যে হরিধ্বনি চলেছিল তা ছিল সহিংস। লক্ষ্যের কাছাকাছি চলে এসে বাহকেরা হিংসার সহযোগে ক্লান্তি ঝরায়। ঠিক তখনই লক্ষ করি পশ্চিম আকাশে একটিই ফুল ফুটেছে! সাদা ফুল। আমি স্বচক্ষে সেই ফুল সেই শুক্রক্ষেত্র দেখেছিলাম। মনে পড়ে গিয়েছিল ভেনাস-৪ এর কথা যে আড়াই কোটি মাইল দূরের ওই উদয়নে অক্ষত দেহে নেমে যেতে পেরেছিল।

—শোণিমা, সুজনদা আমাকে কী লিখেছে জান?

—কী?

—পাহাড়ের ওপরে এক মন্দিরে বসে অপর্ণা গান করেছে।

—কই, দাদা আমাদের এসব কিছু লেখে নি তো?

—ওর গান শুনে ওখানকার পূজারি ওর মাথায় হাত রেখেছেন। [ক্রমশ

যতীন্দ্রনাথ : আধুনিকতার সূচনা

অশ্রুকুমার সিকদার

যাঁদের বলা হয়েছে রবীন্দ্রানুসারী কবি, যাঁরা রবীন্দ্রকবিতার 'রসকল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণের' ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সুধীন্দ্রনাথ চিত্রল পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চিত্রল কোনো-কোনো পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, তেমনি এই রবীন্দ্রানুসারী কবিরা রবীন্দ্রপ্রতিভার আগুনে নিজেদের সঁপে দিয়ে আত্মহারা হয়েছেন। তিনজন কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের সূচনা, সেই তিনজন—মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল—বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রপর্বের সঙ্গে আধুনিক পর্বের যোজকের কাজ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রজগৎ থেকে এই তিনজনের সরে আসার মধ্যেও খানিকটা ভিন্নতা আমরা লক্ষ না করে পারি না। রবীন্দ্রকবিতার ভাবজগৎ থেকে মোহিতলালের কাব্যের ভাবজগতের যেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা আছে, তেমনি কিছু মৌলিক সাদৃশ্যও আছে। আর মানতেই হবে, কবিতার নির্মাণের দিক থেকে তিনি কিছু স্বতন্ত্র কাব্যভুবনের বাসিন্দা নন। আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগপ্রাবল্যের অপরিণত প্রকাশে, আত্ম-অচেতন চিন্তাহীন অনর্গলতায় নজরুল স্বতন্ত্র পথ করে নিলেও, তিনি বুদ্ধিপ্রধান আত্মসচেতন আধুনিক কবির পূর্বসূরি কতটা সে বিষয়ে কিছু সংশয় থেকেই যায়। এই তিনজনের মধ্যে যদি কোনো একজনকে আধুনিক কবিদের যথার্থ পূর্বসূরি বলে বেছে নিতে হয় তাহলে হয়তো যতীন্দ্রনাথকেই বেছে নিতে হবে। কেন, তারই উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে এই ছোটো নিবন্ধে। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলে নেওয়া দরকার মনে করি: এখানে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেগুলি সবই যতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ—"মরীচিকা", "মরুশিখা", "মরুমায়া"—অবলম্বনে। "কচিডাব"-এর মতো অসামান্য বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে "সায়ম্"-পরবর্তী কবিতা আমাদের আগ্রহ জাগায় না। সেই উত্তরকালীন কবিতাকে শশিভূষণ স্বাভাবিক ক্রমপরিণত বলে ব্যাখ্যা করলেও, সেগুলিকে আমাদের অন্তত স্বধর্ম-

চ্যুতি বলেই মনে হয়। প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের জোরেই তিনি দুর্লভ স্বতন্ত্র স্বরের অধিকারী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই নিবন্ধে কবিতায় বিধৃত কবির বিশ্বাসই আলোচিত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়।

ইংরেজ কবি জন ডানের সঙ্গে কিছু-কিছু সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দেখিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের "ঘুমের ঘোরে" কবিতায় যেমন সাতটি ঝোঁক, তেমনি ডানের Satire সাতটি অংশে বিন্যস্ত। ডান ও তাঁর গোষ্ঠীর কবিদের কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাষাগত সংগতি, বাক্‌বন্ধের তির্যকতা, 'telescoping of images' লালিত্য ও পেলবতার পরিবর্তে 'staccato rhythm'। এই গোষ্ঠীর কবিতা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে উদ্ভট সাদৃশ্য আবিষ্কার করে আর চলতি ভাষাই হয়ে ওঠে তার গভীর ভাব প্রকাশের বাহন। এমনকি তপ্ত আবেগময় প্রকাশের মুহূর্তেও এই কবিতায় সচেতন মেধার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি, কারণ এই কবিদের কাছে মননক্রিয়া ছিল অভিজ্ঞতার সামগ্রী। এইসব বৈশিষ্ট্যের দরুন এলিয়ট তাঁর ১৯২১ সালের বিখ্যাত প্রবন্ধে এই মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠীকে নিজেদের সমধর্মা বলে চিনে নিয়েছিলেন। তিনি যখন লিখেছিলেন, 'The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning' তখন সেই কথাগুলো যেমন ডান-গোষ্ঠীর কবিতা সম্বন্ধে বলা, তেমনি নিজের ও সমসাময়িক আধুনিক কবিদের সম্বন্ধেও বলা। ডানকে এলিয়টের আধুনিক বলে মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শাশ্বতভাবে আধুনিক', কারণ ফ্রস্ট বলেছেন, সেই কবিই আধুনিক যিনি 'speaks to modern people no matter when he lived in the world'. যতীন্দ্রনাথের কবিতার এমন কোনো-কোনো আধুনিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্যে ডানের শাশ্বতভাবে আধুনিক কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কথা ভাবা হয়। যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও আমরা পেয়ে যাব 'staccato rhythm', বাক্‌বন্ধের তির্যকতা, তাঁর কবিতাতেও চলতি ভাষাই ভাবপ্রকাশের বাহন।

যতীন্দ্রনাথকে অন্য কোনো-কোনো সমালোচক, যেমন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস, যে টমাস হার্ডির সঙ্গে তুলনীয় ভেবেছেন সেটাও ঈষৎ বিবেচনা করা দরকার, যতীন্দ্রনাথের কাব্যকে বুঝে নেবার আন্তরিক প্রয়োজনেই। হার্ডি 'Humdrum dailiness of life'—জীবনের গদ্যময় দৈনন্দিনকে, বস্তুজগৎকে, আমাদের অতি-পরিচিত স্বাভাবিক পৃথিবীকেই কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। জীবন সম্পর্কে সমস্ত কৃত্রিম ভঙ্গিমা, 'made-up attitude' তিনি বর্জন করেছেন। তার বিরুদ্ধতা করেছেন। তিনি প্রচলিত ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। ছিলেন অজ্ঞাবাদী। জীবন সম্বন্ধে তিনি পোষণ করতেন নৈরাশ্যের মনোভাব। তিনি এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা বা বেদনার কোনো তোয়াক্কা প্রকৃতি বা বিশ্বচরাচর করে না। একেক সময় মনে হয়েছে, যেন হাতের কাছে তিনি যে উপকরণ পেয়েছেন তাকেই হার্ডি কবিতার সামগ্রী করে তুলেছেন বিনা দ্বিধায়। তাঁর কবিতার ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'he mixes the most inappropriate kinds of diction'। মোহিতলালও যতীন্দ্রনাথ বিষয়ে বলেছেন যে তিনি 'প্রচলিত কবিভাষাকে যেন পদদলিত' করেছেন। ভাষার ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথও ভ্রূক্ষেপহীন —'চলতি, সাধু, সংস্কৃত বা ম্লেচ্ছ, চাষা বা ভদ্র—সকলকেই ধরিয়া একাসনে বসাইয়া তিনি একটি নূতন সারস্বত সমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন।' হার্ডি-যতীন্দ্রনাথের তুলনা প্রসঙ্গেই এসে যায় আধুনিকতার সূত্রটি। আধুনিক কবিতা 'লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না,··· তার জোর সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে'। আধুনিকতা 'সাবেক কালের কৌলিন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে

জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই।' সে সজনিকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারে, সজনে ফুলকে নিয়েও লিখতে পারে। এই বাছবিচার না করার ব্যাপারটা যেমন কবিতার বিষয় নিয়ে তেমনি কবিতার ভাষা নিয়ে। জীবনানন্দের আগে ঠ্যাং শব্দটি কবিতায় ব্যবহার করবার সাহস একমাত্র যতীন্দ্রনাথই দেখিয়েছিলেন। হার্ডি এবং যতীন্দ্রনাথ দুজনেই, কাব্যের ইতিহাসের দিক থেকেও আধুনিকদের পূর্বসূরি। সুইনবার্‌ন্ ও প্রি-রাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর শেষ-রোমান্‌টিকতার পরে, পেটার ও অসকার ওয়াইল্‌ডের কলাকৈবল্যবাদী আন্দোলনের পরে, শতাব্দীশেষের হরিদ্রাভ নব্বয়ের পরে কবি হিসেবে স্বতন্ত্র সুর নিয়ে হার্ডির আবির্ভাব হয়েছিল। তিনিই এলিয়ট এবং পাউন্‌ডের জন্য জমি প্রস্তুত করেছিলেন। 'জীবন একটা সুদীর্ঘ বাসররাত্রি', ললিত-মধুর, কটাক্ষপাতে বিলোল, 'এই স্বেচ্ছাবৃত আত্মবঞ্চনা'-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যতীন্দ্রনাথও জীবনানন্দ-প্রমুখের জন্য আধুনিকতার ভূমিকা রচনা করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তৃতীয় জনের তুলনা দেওয়া হয়েছে তিনি বাঙলা ভাষারই লেখক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬)। প্রায় সমান-বয়সী দুজনে। নিরঙ্কুশ আশাবাদে দুজনেরই আস্থা নেই, দুজনে যেন মানবতন্ত্রেও আস্থা হারিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রও, যতীন্দ্রনাথের মতো, তিক্ত রুক্ষ নৈরাশ্যবাদী। দুজনেই মনে করেন মানুষ নিয়তির হাতের মুঠোয় অসহায় খেলেনা। দুজনের রচনাতেই শহুরে পরিশীলিত ভাবটি অনুপস্থিত। বুদ্ধদেব বসু যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে 'আটপৌরে' কথাটা ব্যবহার করেছেন জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথাটা বিশেষ মানানসই। দুজনেই খাঁটি একশো ভাগ বাঙালি হয়েও একেবারে আধুনিক—জীবন সম্পর্কে সচেতন প্রশ্নশীলতায়, তির্যক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে। শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার প্রভৃতির সম্মিলিত প্রয়াসে কথাসাহিত্যে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্র সাহিত্যিক প্রতিবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখের নেতৃত্বে কাব্যসাহিত্যে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল যতীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বাঙলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার বিবেচনা জগদীশ গুপ্তকে দিয়ে শুরু করতে হয়, বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার বিবেচনাও যতীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করা দরকার।

যতীন্দ্রনাথ অবিশ্বাসী কবি। জগৎ সৌন্দর্যময় এবং সুষমাময়—এই রোমানটিক সিদ্ধান্তে তিনি অবিশ্বাসী। ঈশ্বরেও তিনি অবিশ্বাসী, কারণ জগৎ-কারণ কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিলে জগতের বিরোধ এবং সংঘাতকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর তাঁর এই সমস্ত অবিশ্বাস-অনাস্থার মূলে রয়েছে তাঁর জড়বাদ। তিনি বদ্ধমূল জড়বাদী বলেই ভাববাদী সমস্ত ঐক্য ও সামঞ্জস্যবোধকে তিনি অস্বীকার করেছেন। জগৎ সম্পর্কে সমস্ত রোমানটিক বিস্ময়বোধ তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেই কারণেই তাঁর কবিতায় আপতিক বা appearance-এর সঙ্গে বাস্তবিক বা reality-র বিরোধ প্রধান প্রসঙ্গ, এবং যতীন্দ্রনাথ সেই প্রধান প্রসঙ্গকে কবিতার নির্মাণের মধ্যে, তার বাক্‌সংগঠনের মধ্যে অন্তঃস্থ করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, সব সময়ে চলেছে 'নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি', এই নরত্ব তার আদর্শের দিক, আর ভেড়াত্ব তার বাস্তবের দিক। যাকে মনে করা হয় নর, সে আসলে ভেড়া—এই বিরোধ আমাদের সত্তায়, বিশ্বচরাচরে। আমাদের আরাধ্য দেবতা শিব, যার ভালে ছিল সুধাকর টীকা, তার জোটে কালকূট, তার নবনীনিন্দিত তনু অজানা চিতার ছাইয়ে মাখা, যার কণ্ঠে সুরের জন্ম সে শিঙা ডুগডুগি নিয়ে দিন কাটায়। অন্নপূর্ণার পতি হয়েও শিবের পেশা ভিক্ষা। এই এই বদ্ধমূল অবিশ্বাসী কবি জানেন, 'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।' এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি, তখন কবি ধর্মকথায়, ভাববাদে, অভ্যস্তভাবে রমণীয় কাব্যকথায় আস্থা বজায় রাখবেন কী ভাবে?

'পাকানো প্রেমের দড়ি' পদগুচ্ছ যখন পড়ি তখন প্রেমের মাধুর্যময় আপতিকতার স্তর থেকে নেমে দড়ির বাস্তবিকতায় আমাদের পৌঁছতে হয়। সূর্যের কিরণ তুলিত হয় ঝাঁটার সঙ্গে। এইরকম বৈপরীত্যময়তা পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'বেহায়া কোকিল' এবং 'লম্পট হাওয়ায়' কবির আক্রমণ ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ "কোন্ সে নিতল শীতল পঙ্কে ছিল পাঁকালের বাস?" প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দেন, সংস্কৃত পরিশীলিত 'পঙ্ক' আসলে আমাদের প্রতিদিনের পাঁক, তাই তার মধ্যে পাঁকাল বাসা বাঁধে। এমনি ভাবে যা আসল নয়, এবং যা আসল, তার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্যকে শুধু দেখিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন না এই কবি, তিনি তাঁর কবিতার নির্মাণ structure-এর মধ্য দিয়ে তাকে realized বা সম্ভব করে তোলেন। পাশাপাশি শব্দকে বা কল্পনাকে বৈপরীত্যময় সংঘাতে সাজিয়ে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কবিদৃষ্টির বিরল স্বাতন্ত্র্য। তাই এই কবির কবিতায় এমন bizarre, macabre উপমা এসে যায়—

কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য ছিন্ন শিশুকুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

ফুলের কুঁড়ির পাশে কচি শিশুর মুণ্ডের কল্পনাকে স্থাপন করে তিনি আমাদের সমস্ত সত্তাকে আমূল নাড়া দিতে পারেন। তাঁর কবিতায় বউবাজারের মোড়ে ফুলের দোকানের পাশে থাকে মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের দোকান, সূর্যাস্তকালীন গোধূলি পশ্চিমের মেঘ হয়ে যায়, 'রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা' এবং এই জড়বাদী কবির অসামান্য উপমায় জীবনের উৎস সূর্য অস্তগমনকালে যেন দরিদ্র যক্ষ্মা-রোগীতে পর্যবসিত হয়ে যায়, সে 'ছেঁড়া মেঘ পাতি মৃত্যুশয়ন রক্তবমন করে।' যে সম্পর্ককে প্রেম বলে পরিমার্জিত করা হয়, সে অতি মামুলি ব্যাপার, প্রতিরাত্রে নেটের মশারিটা টাঙানোর মতোই মামুলি। তাঁর কবিতায় 'চিতার বহ্নি যতো বিধবার সিঁথির সিঁদুর' চাটে। আপতিক ও বাস্তবিকের বিরোধ মুহূর্তকালের জন্যও ভুলতে পারেন না বলে যতীন্দ্রনাথ ঘোষণা করতে পারেন, 'কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান।' যে কবি "মানুষ", "চাষার বেগার", "দেশোদ্ধার" ('এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার') প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন, যাঁকে এখনকার ভাষায় অনায়াসে সমাজসচেতন কবি বলা যায়, তিনি শুধু মানবসত্তার মধ্যে আপতিক-বাস্তবিকের বৈপরীত্যের কথা ভাবেন নি, তিনি বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তার বাস্তব রূপটির রূঢ় সত্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন। এই বৈপরীত্য-সচেতনতাই তাঁর মতো একজন সিরিয়াস কবিকে প্যারডি লিখতে প্রাণিত করে। তিনি দেখেন, চাষী সনাতন যাদের কবিতার বাস্তুভিটায় জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের প্রেমালাপের দৃশ্য—'ভিটেয় ভিটেয় বসে আছে দেখি বাস্তুঘুঘুর জোড়।' যেখানে এই ধরনের সমাজসচেতনাবোধ, সেখানে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী—প্রেমেন্দ্র মিত্র-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়- বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ আত্মসচেতনতার আতিশয্য। এই আত্মসচেতনতার আতিশয্যেই আধুনিকতা অনেক সময় সমাজাতিরিক্ত, এমনকি অ-সামাজিক হয়ে ওঠে। এই আত্মসচেতন কবি জগৎজীবন সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই তর্কবুদ্ধি, সমালোচনা-বুদ্ধি ও প্রশ্নশীলতার জোরেও তিনি আধুনিক। ধর্ম, সমাজ, তথাকথিত আনন্দবাদ—সব বিষয়ে তিনি প্রশ্নে উদ্যত ও প্রখর। প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়েই তিনি ঘোষণা করেন—

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ,
সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবনের দুখ।

সমাজসংসার সম্বন্ধে, জীবনযাপনের প্রচলিত চেহারা সম্পর্কে বিতৃষ্ণার বোধকে যদি অসামাজিক বলা চলে তাহলে এই কবিও অসামাজিক; যে মিথ্যাচারের সভ্যতা মানুষ গড়ে তুলেছে তার প্রতি একটা

'bitter line of hostility' তাঁর কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর কবিতায় বারে বারে ক্লান্তির কথা। কাক, ক্লান্ত, অপরাহ্নে বৃদ্ধ দিন ক্লান্ত। 'বাহিরে শ্রান্তি, ভিতরে ভ্রান্তি'। এক নির্বেদ ক্লান্তি ও অবসাদ, মানুষের দুর্বলতা এই কবিকে যেন আচ্ছন্ন করেছে। যে ennui বা নির্বেদের ভাব, যে বিচ্ছিন্নতাবোধের বোঝা সহ্য করতে না পেরে, লাস-কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই জেনে, জীবনানন্দের আত্মহননকারী মানুষটি চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে, অথবা অন্য আর-এক কবিতার বক্তা ধানসিড়ি নদীর কিনারে শুয়ে শুয়ে জানিয়ে দেয় 'কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর', অনেকটা সেইরকম ক্লান্তি অবসাদ ও জীবন সম্বন্ধে অনাস্থার বশবর্তী হয়ে যতীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন,

চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি
তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

সংসার আজ অসুস্থ। তার সংকট আর অসুস্থতার চিকিৎসার একমাত্র পদ্ধতি কবির মতে ঘুমিয়ো-প্যাথি। ঠাট্টা করে বলা, কিন্তু সেই কৌতুক বড় বেশি বিষাদে সাশ্রু। তাই জীবনানন্দের মতো তিনিও অন্ধকারের বন্দনা করেন। জীবনানন্দ 'অন্ধকারের সারাংসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে' যেতে চেয়েছেন, যতীন্দ্রনাথও অন্ধকারকে বলেছেন, 'তোমার পাথারে। হউক বিলীন। সত্তা মোর, মোর অহংকার।'

আধুনিকদের পূর্বসূরি বলেই যতীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ স্বতন্ত্র। সেই কাব্যাদর্শকে যতীন্দ্রনাথ অনেক সময় আধুনিকদের মতো—যেমন বুদ্ধদেব বসুর মতোই তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েও রূপায়িত করেছেন। অনেক সময় নিজের কাব্যতত্ত্ব বা কাব্যাদর্শই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়। যেখানে জগতের কলজে অহরহ জ্বলছে, সেখানে মিথ্যে মিষ্টি কথা বলা অনুচিত, নিজেকে ছলনা করা গভীর অন্যায়। প্যাঁচ-বর্জিত তীরের মতো কথাই তাঁর অভিপ্রেত। তাঁর মতো যিনি সত্যদর্শী কবি, তাঁর কাজ নয়, 'উপমার ফাঁস' বুনে আসল সত্যকে চাপা দেওয়া, তাঁর কাজ নয় রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না বুনিয়ে প্রিয়ার বসন রচনা করা। সুতরাং রোমানটিক কল্পনাকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন,

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।

মধুসূদনের 'মাধুকরী কল্পনা' সরস্বতীর তুল্য, দ্বিজেন্দ্রনাথের 'কল্পনা-কুমারী' কবির পথপ্রদর্শিকা, রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা কল্পনার লতা। আধুনিকদের মধ্যে কল্পনার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া তা প্রথম শোনা গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথের রচনায়। রোমানটিক কবির কাছে প্রকৃতি ছিল উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎস শুধু নয়, জীবনাদর্শ প্রকাশের বাহন শুধু নয়, সে ছিল রোমানটিক কবির কাছে গুরুর মতো শিক্ষাদাতা। কিন্তু আত্মসচেতন আধুনিক কবি স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির কাছে শিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হন না, তাঁকে পরিচালিত করে তাঁর চৈতন্য। জড়ের উপর চৈতন্যের নিয়ন্ত্রণ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর কাছে তাই শুধু শ্রদ্ধেয় যা রচিত, যা চৈতন্যের দ্বারা শোধিত। তাই রিলকে জানান, 'Art is a movement contrary to nature'। তাই বুদ্ধদেব বসু পরামর্শ দেন, 'প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে'। সেই কথাই পুরানো বাক্‌বিন্যাসে আগেই জানিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ, 'বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে-মানুষ শিখিবে কিবা?' এইভাবে যতীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব নিয়ে, স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ নিয়ে, আসলে জীবনকে দেখবার ভিন্ন ধরন নিয়ে, রবীন্দ্রানুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যান, আধুনিকদের পূর্বসূরি বলে চিহ্নিত হন। 'সায়ম্' থেকে তাঁর পশ্চাদপসরণ দুর্ভাগ্যজনক। তিনি যত বড়ো কবি, যদি তার চেয়েও বড়ো কবি হতেন, তাহলে হয়তো 'বিদ্রূপপরায়ণ অবিশ্বাসের আমি' থেকে তাঁর যে প্রথম পর্বের কবিতার সূত্রপাত, তাকে হয়তো এক মহত্তর ইতিবাচক উত্তরণে পৌঁছে

দিতে পারতেন। তা সম্ভব হয় নি, শেষ পর্যায়ের কবিতা যেন অবিশ্বাসকে suspend করে বিশ্বাসের কবিতা। ব্যক্তিগত বিশ্বাস কবিতায় বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যা আমরা পেয়েছি তার জন্যেই কৃতজ্ঞ আমরা, আধুনিক কবিরাও, কেননা তিনি তাঁদের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য অকাদেমি-আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

অন্নমণি বেওয়া

দুর্গা বসু

এক

পোশাকি নামটা পালপাড়ার মানুষ ভুলে গেছে। ছোটো বড়ো সবার কাছেই তিনি 'পরেশের ঠাকমা'। বাহাত্তর বছর বয়সে এখন অনেকটা স্থবির। চোখে ছানি, কম দেখেন। শিরদাঁড়াটাও নুয়ে পড়েছে খানিকটা। খাটবার শক্তি গেছে। একটুতেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন। ঝুপড়ির দাওয়ায় চালের খুঁটি ধরে বসে হাঁপাচ্ছিলেন। এরকম কিন্তু ছিল না। পোশাকি নামটাই ছড়িয়ে গেছল সারা জয়নগর থানায়। অন্নমণি পালের হাতে তৈরি পুতুল-প্রতিমার চাহিদা ছিল কুলপি থেকে ক্যানিং জুড়ে। তাঁর খোদাই-করা টেরাকোটা টালি আজও রয়েছে বহড়ুর কালী-বাড়িতে, ময়দার বিবিমা মন্দিরে, কীর্তনখোলাঘাটের চাঁদনিতে। ভাঁটির নোনা হাওয়ায় টালির কারুকাজ অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অন্ন ঠাকুরনের মতোই।

মাসকেল। মাটির তাল জল দিয়ে ভিজিয়ে, দু পায়ে চটকে নরম করা হয় জায়গাটায়। অন্নমণি কোনোদিন মাসকেলে পা দেন নি। শ্বশুরের নিষেধ ছিল। মাসকেল পবিত্র রাখতে হয়। কাজের শেষে ধুয়েমুছে গোবর নিকিয়ে ধুপ-ধুনো-ফুল দিয়ে শুদ্ধ আচারে বাতি দেখাতে হয় রোজ। মেয়েমানুষ মাসকেলে পা ছোঁয়ালে ঘরে অলক্ষ্মীর বসত্ হয়। অন্নঠাকুরন তাতে দমে যান নি। গোয়ালে পড়ে ছিল খড়কাটার মোটা পাটাতন। সেটার উপর তিনি মাটি মাখতেন। পা দিয়ে নয়, হাতে। তারপর আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে গড়ে তুলতেন লক্ষ্মীনারায়ণ, বেনে বউ, গণেশজননী, জগন্নাথ। নয়তো তৈরি করতেন হাতি, ঘোড়া, পরী, টিয়া, কাকাতুয়া। নরুন দিয়ে কেটে বানাতেন তাদের চোখ, মুখ, জামা, গয়না, ডানা, পালক। পুহানের আগুনে পুড়ে লাল শক্ত হয়ে উঠত পুতুলরা। এবার অন্নমণি বসতেন তাঁর পটিদারি সরনজাম নিয়ে। রঙ, তুলি, ঘামতেল।

রঙ করতেন উপোসি থেকে। কাজ শেষ না হলে জল গ্রহণও করতেন না। তাঁর আঙুলের ছোঁয়ায় পুতুল-গুলো রূপে রঙে হয়ে উঠত সুন্দর, জীবন্ত, শিল্প-সুষমায় মৌনমুখর।

প্রতিমা গড়ার ফরমায়শি কাজও করতেন অন্নমণি। বাঘের পিঠে হাঁটু গেড়ে বসে হলুদ রঙের দক্ষিণ রায়; ইয়া গোঁফ, হাতে তরোয়াল। কিংবা পঞ্চানন্দ ঠাকুর। ওরফে পাঁচুঠাকুর। লাল টকটকে, মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। অথবা টুপি মাথায় জঙ্গলের বাদশা শা-জঙ্গুলী। বড়ো খাঁ গাজী। মানিক পীর। কালু রায়। 'রায়মঙ্গলের' লৌকিক দেবতা সব। সাগরপারে হারানো বাপকে খুঁজতে যাবে সদাগর পুষ্পদত্ত। বনে গেল কাঠ কেটে ডিঙি বানাতে। মনপসন্দ গাছ বলে যাতে কুড়ুলের কোপ দিল তা হচ্ছে খোদ দক্ষিণ রায়ের সম্পত্তি। দেবতার ব্যাঘ্রবাহিনী মেরে ফেলল কাঠুরেদের। শেষে দক্ষিণ-রায়ের পুজো দিয়ে উদ্ধার পেল পুষ্পদত্ত। ডিঙি ভাসাল সাগরের জলে। ভাসতে-ভাসতে পৌঁছায় পীর বড় খাঁ গাজীর মোকামে। মুসলমান বলে গাজীর পুজো না দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল তারা। আর যায় কোথায়। ধুন্ধুমার বেধে গেল গাজীর সাথে দক্ষিণ-রায়ের। দু-দলের সৈন্যই বাঘ। বিষম যুদ্ধ। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। শেষে ভগবান অর্ধেক পাঁচুঠাকুর অর্ধেক শা-জঙ্গুলীর রূপে এলেন আপোস করতে। তিনি পরমেশ্বরও, আবার পয়গম্বরও। মাথায় তাঁর টিকিও আছে, টুপিও আছে। 'কোরান পুরান দুই হাতে।' তিনি ফতোয়া দিলেন এ পথে হিন্দু মুসলমান যেই যাবে তাকে পুজো দিতে হবে বনের তিন শরিকের। পীর বড় খাঁ গাজী, বাঘদের প্রভু দক্ষিণ-রায় আর কুমিরদের ঠাকুর কালু রায়ের।

কাজেই মাঝি, মাল্লা, মাছমারা, মধুর কারবারি-দের ফরমায়শি কাজের বিলক্ষণ চাপ ছিল। লোকে প্রশংসা করে কিনে নিয়ে গেছে সেসব প্রতিমা। ভালো দাম দিয়ে। একবার মালকোঁচা-মারা আটেশ্বরের মূর্তি গড়েছিলেন অন্নমণি। শ্রীকৃষ্ণের মতো গায়ের রঙ, মাথায় পাগড়ি, হাতে মুগুর, কানে মাকড়ি, গালপাট্টা গোঁফ—ভয়-জাগানো চেহারা। এস. ডি. ও. সাহেবের বিলিতি বন্ধু এসেছিলেন শিকারের খোঁজে। মূর্তি দেখে খুব পছন্দ। আড়াই কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন। মাদ্রাজের প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছিল মূর্তিটা। শিকারি-সাহেব এস. ডি. ও. মারফত মেডেলটা পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন অন্নমণিকে। দুগ্‌গাপুর-পালপাড়ার সবাই তো কুমোর। অন্নমণি কেবল কুমোর ছিলেন না, শিল্পীও ছিলেন। কাজ করতেন কেবল পয়সার তাগিদে নয়। প্রাণের তাগিদেও।

আজ আর নজর চলে না। হাত নড়বড়ে। বয়সের সাথে-সাথে ঘটে বুদ্ধিও কমেছে। মুশকিলটা এই-খানেই। একদিন নিজের গুণী হাত লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছিল কোঁচড়ে। আজও তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, খেটে-খাওয়া মানুষের পয়সার অভাব হবে কেন? এই নিয়ে ছেলে-বউয়ের সাথেও তাঁর লড়াই হত। ছেলে-বউ অন্নমণির দাপটের দিন দেখেছে। তর্ক করতে সাহস করত না। নাতি পরেশ আর নাতবউ চিন্তে কিন্তু আমল দিতে চায় না স্থবির বৃদ্ধাকে। নাতবউ যেদিন চাল-পাচারে নামল বুড়ির সেদিন দারুণ অশান্তি। গজগজানি আর থামেই না। দুদিন মুখে কুটোটিও কাটেন নি। বিপদের মুখে বউকে ছেড়ে দিতে পরেশেরও মন চায় না। কিন্তু উপায় কী? ঠাকমা প্রতিমা বানাতেন; তাঁর কথা আলাদা। তখন দিনকালও ছিল সস্তা-গণ্ডার। আজ কেবল মাটির হাঁড়িকুড়ি বেচে সংসার চলে না। ফলে চিন্তেকে বাড়ি থেকে বেরুতেই হয়। তবে দিদিশাশুড়িকে এড়িয়ে। লুকিয়ে-চুরিয়ে। এ-এক আচ্ছা মুশকিল।

অন্নমণি দাওয়ায় বসে কোঁচড় থেকে খুঁটে-খুঁটে মুড়ি খাচ্ছিলেন। দু-পাঁচটা মুড়ি আঙুল গলে ছড়িয়ে পড়ছিল এদিক-ওদিক। গোটা চারেক চড়ুই পাখি

ছড়িয়ে পড়া মুড়ির লোভে ঘিরে ধরেছিল ঠাকুরনকে। স্থবির অন্নমণিকে ওরাও ভয় পায় না। চাকতলা থেকে বেরিয়ে এল পরেশ। গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে-মুছতে। অন্নর সামনে এসে বলল, 'ঠাকমাগো এট্টা কাজ ঠিক করে ফেলালাম। পলতা যেতি হবে। ইটভাঁটার কাম। গেরামে তো নাগাড়ে শুধু কষ্টই।'

চমকে ওঠেন অন্নমণি। ইটভাঁটার কাম মানে? ইটভাঁটায় তো ছাঁচে মাটি ঠেসে ইট বানায় মাটিকাটা দিনমজুর। সেখানে পরেশ পাল কী করবে? 'পালন-কর্তা মান্‌ষি পালেন, পালে পালে পিরতিমে'। দেবতা আর পালের কাজে ফারাক কোথায়? নিজেও তো সারাজীবন দেবতার 'পিরতিমে' পালন করেই কাটালেন। তাঁরই নাতি কিনা চাক বিসর্জন দিয়ে ইটভাঁটার ছাঁচ ধরতে চায়! ছাড়তে চায় বাপ-পিতেমোর ভিটে? চাকের কিল তো স্বয়ং নারায়ণ-শিলা। তাঁকে বেড় দিয়ে চাক ঘোরে যেন সুদর্শন-চক্র। সেই চক্রকে থামিয়ে দেবে পরেশ? দুটো পয়সার লোভে আদিবাসী কুলিকামিনের পাশে ব্রহ্মডাঙার মাঠে বসে ছাঁচ বানাবে চৌকো ইটের সারি? ও কাজে লাগে না মগজ, চোখ, এমন কি আঙুলের কারিকুরি। লজ্জায় ঘেন্নায় স্তব্ধ অন্ন তাকান নাতির দিকে। ঘোলাটে চোখে পরেশের ঝাপসা চেহারা দেখে 'বুঝতি নারেন লাতিন হাসতিচে না কাঁদতিচে।'

দুই

পরেশ গুম হয়ে বসে ছিল। রেগে আগুন হয়ে। পঞ্চায়েতকে কত খোসামুদি করে, বলতে গেলে একরকম প্রধানের পায়ে ধরে নামটা তুলিয়েছিল কে. ভি. আই. সির খয়রাতি লিস্টে। খাদি ভিলেজ ইনড্রাসটিজ কমিশন ছ শ টাকা করে অনুদান দেবেন ভাঁটির দুঃস্থ কুমোরদের। আর সেই সঙ্গে যোগাবেন সরকারি চাক। সাবেকি চাকের তুলনায় হালকা। ঘোরানো সহজ। ঘোরেও অনেক বেশি সময় ধরে। সিকি ঘোড়া মোটর বসিয়ে নাকি বিজলীতেও চালানো যায়। শুনে ইস্তক পরেশের চোখ দুটো লোভে চকচক করছিল। এমন খয়রাতি লিস্টে নাম তোলা কি চারটিখানি কথা। বহড়ু বাজারে খবর ছড়াতেই লাইন লেগে গেছল পঞ্চায়েত অফিসের বারান্দায়। ঠ্যালাঠেলি। ধাক্কাধাক্কি। ক্যাঁচর ম্যাচর। প্রধানের পরিবারকে অনেক হাঁড়ি, সরা, মালসা, ধুনুচি, লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেট দিয়ে, দিনের পর দিন নাগাড়ে কাঁদুনি গেয়ে লিস্টে নাম তুলেছিল পরেশ। ভালোমন্দ হরেক রকম বুদ্ধি খেলিয়ে। আর বারুই-পুর থেকে পার্টির ফড়ে বাবুরা এসে কিনা ঘ্যাচাং করে তার নামটাই দিল কেটে। শুয়োরের পোরা বলে কিনা—সে নাকি পার্টির লোক নয়। এই যে জগা, এই অতুল খুড়ো, প্রফুল্লদা ঢালাও অনুদান পেয়ে ফুলে উঠেছে, এই সুমুন্দিরা পার্টির কোন্ বাপকেলে লোক? সবাই তো তার মতোই হাঘরা, চোপর দিন মাটি নিয়ে কস্তাকস্তিতে মত্ত। মিটিং মিছিল করার ফুরসত আছে কোন্‌টার? কই তাদের তো নাম কাটা গেল না। তার বেলাই যত 'জেতের বিচার'?

কার্তিক থেকে চৈত্র—ছ মাস পালদের কাজের মরশুম। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা কুমোর-বাড়ি চাক ঘুরছে তো ঘুরছেই। দুহাতে মাটি কাটো, ছানো, দুপায়ে মাটি ঠাসো, তারপর চাকের মাথায় মাখনের মতো একদলা মাটি থাবড়ে-থাবড়ে গড়ে তোলো হাঁড়ি, কলসী, খুরি, গেলাস। রাত ঘন হলে পুহানে কাঠ, খড়, নারকোলপাতা সাজিয়ে আগুন দাও পাঁচুঠাকুরের নাম করে। জয় বাবা পঞ্চানন্দ। সারা রাত ধরে জ্বলে রাবণের চিতে। পালা করে জাগতে হয়। লাটের মাল কাঁচা থাকতে আগুন নিবে গেলেই চিত্তির। ভোরবেলা পুহানের ছাই সরাতে বেরিয়ে এল লাল-কালো-বেগুনি বাসনের সারি। সাত সকালেই পাইকার হাজির। ছোঁ মেরে মাল তোলে সাইকেল ভ্যানের পিছনে। দরদাম করার সময়টুকুও দেয় না। এ হল কাজের মরশুম। তখন

কুমোরদের খাবার ফুরসত নেই। বাকি ছ মাস বেকারির মরশুম। মাঠে ঘাটে এককোমর জল। কাটার যুগ্যি ডাঙাজমি মেলা ভার। এ ক মাস আবার কাজ নেই বলে পালরা উপোসি থাকে। কাজে অকাজে, সুখে অসুখে কখনই ভরপেট অন্ন জোটানো কপালে নেই কুমোরদের।

আর পারে না পরেশ। শরীর মন দুই অবশ হয়ে পড়েছে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তিরিশ টাকার কাঠ পোড়ালে বাসন বেরোয় খুব বেশি তো একশো টাকার। এর উপর আছে খড়, রঙ, নারকোল-পাতা, পুহান গড়ার মজুরি। জয়নগর বারুইপুরের বাবুভাইদের মন কাড়তে রঙই লাগে কত রকম। বক্স, নোলে, এলা, চন্দ্রকোনা, উবরণী। সাদা, কালো, হলুদ। কোনোটা বা মেটে। কোনোটা গাঢ় লাল, যেন কুমোরের বুকচেরা রক্ত। পোড়া মাটির বাসন ছাড়া সব কিছুর দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। আবার নতুন ফ্যাচাং হয়েছে, পঞ্চায়েতি লাইসেন্স। ব্যাবসা করতে হলে, সরা খুরি বেচতে হলে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয় নগদ দশ টাকা জমা দিয়ে। আগে পুকুরের পাঁক মিলত বিনা পয়সায়। পুকুর মালিককে একটাকা সেলামি দাও। আর সূয্যি ওঠা থেকে সূয্যি ডোবা ইস্তক নাগাড়ে কেটে নাও মাঠির পাহাড়। সে দিনকাল আর নেই। মেদিনী মায়ের দান। তাও কিনতে হয় হাত মেপে। ছ হাত লম্বা, ছ হাত চওড়া। গভীরে যাও পাঁচ হাত। নগদ দাম পঞ্চাশ টাকা। 'নিতি হয় নাও নয়তো পথ দেখো। মেলাই নোক কোদাল বাগ্যে বসে আচে।' মাটির কারবার এখন পালদের একচেটে নয়। মাটি সাপলাইয়ের কারবারে এখন রমরমা। শহরে বাস্তু জমিতে টান ধরেছে। দিনরাত ভরা হচ্ছে খানা-খন্দ-খাল-বিল। জয়নগর, মজিলপুর, ডায়মনডহারবার, সরসুনা, জোকা, বারুইপুর, বোড়াল, সোনারপুর। শহরে খানা-খন্দ কমছে আর ভাঁটির গ্রামে খানা-খন্দ বাড়ছে। লরিওয়ালাদের সাথে পাল্লা দেয়ার সাধ্যি দুগ্‌গাপুর-পালপাড়ার কুমোরদের নেই। চাক ঘোরানোয় ঘেন্না ধরে গেছে পরেশের। 'চোপরদিনে বিশ ট্যাকা রোজগার হলে বলতি হবে বাপের ভাগ্যি।'

খবরটা এনেছিল মোল্লাপাড়ার কাদের চাচা। ওর ফুফার ছেলে দুশ আঠারো নমবর রুটে কনডাকটারি করে। তার মারফতই খবরটা জেনেছিল চাচা। পলতার সরকারি ইটভাঁটায় ফুরনে লোক নেবে। সিদ্ধি ভাঁটা-মালিকের বন্ধুয়া মজুরির ফেরেপ-বাজি নয়। সরকারি খাতায় নাম উঠবে। আটটা-চারটে ঘড়ি ধরে আটঘণ্টার ডিউটি। শনিবার খাতায় টিপছাপ দিয়ে 'হপ্তা' তোলো। নগদ একশ কুড়ি টাকা। মাটিকাটা সরদার আর কুমোরদের নেবে সব্বার আগে। পরে অন্যদের চানস। যদি দুটো পয়সার মুখ দেখতে চাও তো পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট নিয়ে শেয়ালদায় চাপো গিয়ে পলতার ট্রেন। পরেশ নেচে উঠেছিল খবর শুনে। তিন জনের সংসার তার। সে, বুড়ি ঠাকমা আর পোয়াতি বউ চিন্তে। আর এই ভাঁটির দেশে পড়ে থেকে মার খাবে না পরেশ। প্রধানের পরিবারকে আর-একদফা মাটির হাঁড়িকুড়ি ঘুষ দিয়ে আদায় করবে পঞ্চায়েতি সারটিফিকেট। তারপর বাক্‌স-বিছানা ঘাড়ে চলে যাবে পলতা বউ ঠাকমাকে সঙ্গে নিয়ে। ফুর্তিতে তার গলায় গান এসে যায়।

দুগ্‌গাপুর-পালপাড়ার কুমোরদের ইদানীং বড়ো দুর্দিন। সস্তা রঙিন পেলাসটিকের থালা, ডিশ, কাপ, বাটিতে বাজার ছেয়ে গেছে। লোকেরও বেড়েছে দাম দেবার ক্ষমতা। মাটির হাঁড়িকুড়ির বাজার অনেক পড়ে গেছে আগের থেকে। এককাল ছিল যখন হাঁড়িই তৈরি হত আট দশ রকম—ভাতের হাঁড়ি, দইয়ের তিজেল, দর্পণ হাঁড়ি, জাবনার ডাবর, সন্ধ্যা হাঁড়ি, হবিষ্যির মালসা, বরণহাঁড়ি, মেজলি, দ্বারঘট, দেবীঘট, কলসী। আজ আর সেসব হয় না। মাটির হাঁড়িতে রান্নার অনেক হ্যাপা। দেশে শ্রাদ্ধশান্তি

পুজো আর্চাও কমেছে। সবকিছুই সবাই সারছে নম নম করে, শর্টকাটে। জলের মটকা কুজোরই বা চাহিদা কতটুকু। এক আছে খুরি গেলাস। তার বিক্রিও পড়তির দিকে। চায়ের দোকানের খরিদ্দারের পছন্দ চিনেমাটির সাদা কাপডিশ। দোকানদারেরও। গরম জলে ধুয়ে নিলেই হল। ফুটো, ভাঙা, ফাটার ঝামেলা নেই।

গড়ার খরচ বাড়ছে। অথচ সেই তুলনায় দাম গলে না পাইকারের হাত দিয়ে। বড়ো হাঁড়ির শ আশী নব্বই। দই-মিষ্টির তিজেল খুব বেশি তো বিশ-পঁচিশ টাকা। অথচ মাটিকাটা মুনিষের মজুরি বেড়ে ডবল। একশ টাকার মাটিতে দুশ টাকার বাসনহয় কি না হয়। এরপর আছে পুহানের আগুন দেওয়ার খরচ। কাঠ, খড়, গোলপাতা। সবই আক্রা। উদয়-অস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর দিন গেলে কুমোরের ট্যাঁকে বিশ টাকাও আমদানি হয় না। অথচ কুমোরের বৃত্তি নাকি 'অসুর-হারা' কাজ। 'নাগাড়ে খাটতি খাটতি অসুরেরও দম বেইরে যায়।' ছোটো সংসার বলে পরেশের কোনোরকমে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কাল বাদে পরশু সংসার বাড়বেই। চিন্তের পেটে পয়লা নমবর তো এসেই গেছে। আকাশপাতাল ভেবে পরেশ মনস্থ করে ফেলে। বোশেখ মাসে চাক ধুয়ে-মুছে কিলের উপর ঝারা বাঁধে পালরা। মাটি মাখার আঙনায় ফুলবেলপাতা দিয়ে পুজো দেয় পাঁচুঠাকুরের। এবার পরেশ তুলে দেবে ওইসব লোকদেখানো ভক্তির পাট। পয়লা বোশেখই চাক বেচে সপরিবারে চলে যাবে পলতা। পেটে খেলে পিঠে সয়। এবার বোধহয় তার মুশকিল আসান হতে চলেছে।

তিন

চাক ছুঁতে নেই মেয়েদের। চাকের কিল হচ্ছেন স্বয়ং পাঁচুঠাকুর। শালগ্রামশিলার মতোই পবিত্র। মেয়েদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হয়ে যান। মেয়েরা চাক ঘোরাতে পেলে হয়তো সংসারের অভাব খানিকটা মিটত। মেয়েদের মধ্যে যাদের হাত পরিষ্কার তারা অবশ্য বর-বাপ-ছেলেকে সাহায্য করে ছাঁচে ছাপা নকশাদার সরা, প্রদীপ, বাহারে পুতুল বানিয়ে। তুলি দিয়ে রঙিন ডিজাইন এঁকে। এই তো পরেশের ঠাকমার এককালে দারুণ নামডাক ছিল পুতুলপ্রতিমার কাজে। তবে তার জন্য হাত থাকা চাই, নজর থাকা চাই। চাষার ঘরের মেয়ে চিন্তের ওসব বালাই নেই। লাউ কুমড়ো ফলাতে জানে, কিন্তু পুতুলপ্রতিমা? তার তৈরি প্রদীপও দেখতে বদনার মতো হয়ে যায়। বিয়ের পর দু-চার বার চেষ্টা করে সখীদের হাসাহাসিতে হাল ছেড়ে দিয়েছে চিন্তে।

তার বাপের বাড়ি পাথরপ্রতিমার গঙ্গাপুরে। মা ছিলেন কাজের মানুষ। ঘরে বসে তৈরি করতেন আসন, নকশি কাঁথা। রঙিন সুতো দিয়ে কাপড়ে ফুটিয়ে তুলতেন মাছ, তারা, ফুল, আটঘুঁটি খেলার ছক, গোলকধাম। গঙ্গাপুরের নকশি কাঁথার কদর সারা ভাঁটি জুড়ে। মায়ের কাঁথা বেচতে নিয়ে যেত মথুরা-পুরের মহাজন মধু সাহা। আজ চিন্তের আপশোস হয় কাঁচা বয়সে এক্কাদোক্কা না খেলে যদি মায়ের কাছে হাতের কাজ শিখত। কিছু একটা না করলে সত্যি চলছে না। অভাবের সংসার। ঠোঙা তৈরি, ঝিঁড়ে বানানো, ঝাঁটা বাঁধা, এটা সেটা অনেক কিছু চেষ্টা করতে-করতে শেষকালে চিন্তে নেমে পড়ল চাল পাচারের ব্যাবসায়। পাড়াতুতো ননদ সন্নো তাকে সন্ধান দিয়েছিল এই লাইনের। বলেছিল, 'চিন্তেবউ, চাষীদেরকে ট্যাকা দ্যে ধান নিবি। সেদ্দ শুকানো করে কলে ভাইঙে ঘর নে যাবি। পরের দিন, ঝুঝরবেলা অন্দকার থাকতি চাল নে ময়দার মোড়ে ফাস্ট বাস ধরতি হবে। তবে তো আত ফরসা হবার মুখে বারাই-পুর চাউলখোলায় পৌছতি পারবি। পাইকেরের গুদামে ওজন করে মাল বেচবি। ট্যাকা নিবি। খালি বস্তা ঘাড়ে নে গাঁয়ে ফিরতি দুফুর হবে।' চিন্তে বড়ো-বড়ো চোখ মেলে শুধিয়েছিল, 'হাই সন্নো, অ্যাতো

খাটনি? লাভ কী থাকে?' সন্নো একটু গম্ভীর হয়ে যায়, 'না গো চিন্তে বউ, আগের বাজার আর নাই। দিন আট-দশ ট্যাকা থাকে। তবে তা থিকে দিতে-থুতেও হয়। বাসওলা দু ট্যাকা নেয় মালের ভাড়া। আবার ভ্যানভাড়া আছে। পুলুশও মুশকিল বাধায়। কিন্তু কী করবি বউ, বাঁচতি তো হবে।'

সেই থেকে চিন্তে কর্ডন এড়িয়ে চাল পাচারের খেলায় নেমেছে। যাতায়াতের পথে পড়ে শ্যামসুন্দরের আটচালা। দুবারই চিন্তে ভক্তিভরে প্রণাম করে। মনে মনে বলে, 'হাই ঠাকুর, চোরাচালানের এ নাইন বড়ো পাপের। মান ইজ্জতে টান পড়ে য্যাখন ত্যাখন। কী করব, পেটের দায় বড়ো দায়। তুমি আমার সাথে থেকো ঠাকুর। বিপদে পড়লি এটটু ঠ্যাকা দিও।' মাঝে-সাঝে দশ-বিশ টাকা তুলে দিচ্ছিল পরেশের হাতে। পরেশেরও তাতে সুসার হত বই কি। তবে ইদানীং চিন্তে আর পেরে ওঠে না। পেটে শত্তুর আসা ইস্তক অল্পেই নেতিয়ে পড়ে। বস্তা ঘাড়ে হাঁটার জোর পায় না। একদিন বারুইপুর গেলে তিন দিন যায় ধকল সামলাতে। রোজগারটা কমে হপ্তায় বিশ-পঁচিশে দাঁড়িয়েছে। তাও আর বেশিদিন চলবে না। পরেশের বাপ-পিতেমোর কারবারে তো হাড়ির হাল। নিজের রোজগার বন্ধ হলে না খেয়ে মরতে হবে। এই চিন্তা-টাই চিন্তামণির সকল চিন্তার মণি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিন্তের চোরাকারবার পরেশের একেবারেই পছন্দ নয়। একবার আর. পি. এফ. কি হোমগার্ডের খপ্পরে পড়লেই সর্বনাশ। সে নিজে দেখেছে বারুইপুর ইসটিশানের খোলা প্লাটফরমে উঠতি বয়সের মেয়ে-বউদের চাল তল্লাসির নামে কী বেইজ্জতি করছে পুলিশ। চিন্তে বউ যদি এই পোয়াতি অবস্থায় কোনোদিন ধরা পড়ে ওই নেকড়েগুলোর হাতে? ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে পরেশের। দুজনে শুয়েছিল পাশাপাশি। পরেশ হঠাৎ আঁকড়ে ধরে বউকে। চিন্তামণির ঘুম এসে গেছল। পরেশের ভয়মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, 'কাম বন্ধ করতি চাইলে তো কাল সকালাই করা যায়। কিন্তু তারপর? মুনিষের তিন দিনের পয়সা বাকি; কালকের ভ্যান-ভাড়াও দাও নি। সামলাবে কী করে? অত ভেবো নি, ঝা হয় হবে। আমার শ্যামসুন্দর আচেন। তিনিই ঠ্যাকাবেন।'

পলতার মতলবটা মগজে খেলতে আনন্দে উড়ছিল পরেশ। পুরুষের উপযুক্ত রোজগারই শুধু নয়, পাকাপাকিভাবে পোয়াতি চিন্তেকেও সরিয়ে আনা যাবে বিপদের হাত থেকে। মুখে স্বীকার না করলেও, চিন্তেও ভয় পায় খাঁকি পোশাকের জানোয়ারগুলোকে। তার এতটুকু ইচ্ছে করে না ভারী বস্তা মাথায় সদর রাস্তা দিয়ে দৌড়দৌড়ি করতে। চালখোলার গায়ে-পড়া মানুষগুলোর কাছে হাত পেতে পয়সা নিতে। জয়নগর রুটের ঝড়ঝড়ে বাসে আলুর বস্তার মতো ঠাসা অবস্থায় রোজ বারুইপুর পর্যন্ত মাকু মারতে। তাই সেদিন রাতে পরেশ যখন তাকে পলতার ইট-ভাঁটার খবরটা দিল তখন ভবিষ্যতের ছবিটা চিন্তার বড়ো রঙিন মনে হল। মনে-মনে চিন্তে মুশকিল আসানের কামনায় আসানবিবির পুজো মানত করল। আসানবিবি ভাঁটির মানুষের সব আপদ বিপদ কাটিয়ে দেন। বড়ো ভালো ঠাকুর তিনি। ভাঁটির মা।

পরের দিন ভোরে চাল নিয়ে বেরুল না চিন্তে। সন্নো ডাকতে এসে ফিরে গেল। চিন্তে পুকুর থেকে নেয়ে এসে পরিপাটি করে সিঁদুর পরল। আলতা পরল। তোলা ডুরে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ফুল কুড়ল শিউলিতলায়। তারপর ভরা মনে হাজির হল শ্যামসুন্দরের আটচালায়। কবে যাওয়া হবে পলতায়, সে ঠিক জানে না। তাতে তার মতলব করা আটকাল না। কী কী সঙ্গে নিয়ে যাবে, কোন্ জিনিসটা তোরঙ্গে নেবে আর কোন্‌টা যাবে কাপড়ের বোঁচকায় —মনে-মনে অজস্র ফর্দ তৈরি করে ফেলে সে। ঢেঁকিটা তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওটা সন্নোর মাকে দিয়ে যাবে। ওঁর অনেকদিনের একটা অভাব মিটিয়ে দেবে চিন্তে। সেই সাথে সন্নোকে দিয়ে যাবে

চালের খালি বস্তাগুলো। সন্নোর তাতে খুব সুবিধে হবে। অবশ্য সব কটা দিলে চলবে না। একটা তার নিজেরও দরকার হবে হাঁড়ি-কড়াই-থালা-গেলাস গুছিয়ে নিতে। সমস্যা দেখা দিল শিলটা নিয়ে। ও তো প্যাঁটরাতে আঁটবেও না। আবার বস্তায় ভরলে বাসনের দফারফা হবে। লনঠনটা প্যাকিং করাও মুশকিল।

সমস্যাটা পরেশকে বলতে সে নিমেষে মুশকিল আসান করে দিল। শিল যাবে বিছানার মধ্যে। তোশক-মোড়া অবস্থায়, বালিশগুলোর মাঝখানে। পড়ে গিয়ে ভাঙবার, চোট হবার কোনো ভয় থাকবে না। আর লনঠনটা? পুহানের খড় দিয়ে পেঁচিয়ে মুড়ে নেবে মাটি ভেজানোর লোহার বালতিটার ভিতর। লনঠনের কাঁচও অটুটভাবে পৌছবে পলতা। চমৎকার। চমৎকার! সব প্ল্যানমাফিক রেডি। এখন গোছগাছে হাত লাগালেই হয়। একটা কাজ অবশ্য বাকি রয়ে গেছে। পলতা যাওয়ার ব্যাপারে দিদিশাশুড়িকে রাজি করানো। বুড়ি মতলবটা শুনে ইস্তক মুখ গোঁজ করে আছে। ওঁর পুজো এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। ওঁকে আর-একদফা বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। তারপর পুজোর পটগুলো ভরে নিতে হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। চিন্তে পা বাড়াল ঠাকমার ঝুপড়ির দিকে।

চার

ভারি মুশকিল। কদিন ধরে দারুণ মনকষাকষি চলেছে তিনজনে। অবুঝ ঠাকমা দুগ্‌গাপুর-পাল-পাড়ার বাইরে পা বাড়াতে, পরেশের ইটভাঁটায় দিন-মজুরি করার প্রস্তাবে নারাজ। তাতে নাকি 'শিল্পীর মান থাকবে নি'। মনে মনে গজরায় পরেশ। মান দিয়ে কি পেট ভরবে? মান দিয়ে কি লজ্জা নিবারণ হবে? আর শিল্পীই বা কিসে? ঠাকমা একদিন হয়তো সত্যিই শিল্পকাজ করতেন। কিন্তু আজ তো তার কিছুই বাকি নেই। পরেশ না খাওয়ালে তাঁকে তো দোরে-দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। শক্তিহীন বিত্তহীন অন্ধ বুড়ির কিসের এই দেমাক? ভেবে পায় না পরেশ। ভেবে পায় না চিন্তেও। মা হতে চলেছে সে। শরীরে একে-একে ফুটে উঠছে ভাবী মাতৃত্বের লক্ষণ। সন্নো বলছিল, 'এবার চিন্তে বউ তুমি ঘরে একটু থিতু করো। না হলি কোন্‌দিন পথেই বিপদ ঘটাবে।' কিন্তু চিন্তে বিশ্রাম নেবে কিভাবে? দুদিন না বেরুলে তহবিলে টান ধরে। পলতা চলে যেতে পারলে হত একরকম। পরেশের রোজগার বাড়লে দুদণ্ড জিরেনের অবসর মিলত চিন্তের। বেশি দেরি হলে কি আর পোয়াতি শরীর নিয়ে বিদেশ-বিভুঁয়ে পাড়ি দেওয়া যাবে? অধৈর্য লাগছে চিন্তামণির।

অধৈর্য হয়ে উঠেছে পরেশও। পয়সার চিন্তাটা তাকে পাগল করে তুলেছে। অথচ ঠাকমা নির্বিকার। কোথা থেকে কিভাবে পয়সা আসবে তা নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই বুড়ির। মাথায় কেবল ঘুরছে শিল্পীর মান, বাপঠাকুর্দার ভিটে, চাক সাক্ষাৎ সুদর্শনচক্র —সব মনগড়া তত্ত্ব। দুপুরে ঠাকমার সাথে একচোট হয়ে গেল পরেশের। মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেছল কথাটা, 'ঘরে বসি গিলতিচ, কোথা থেকে আসতিচে এই রাজভোগ তার খোঁজ রাখ?' অন্নমণির মনে হয়েছিল 'লাতিন' যেন তাঁকে চাবুক মারল। বয়স সাড়ে তিন কুড়ি পার হল, শ্বশুর-সোয়ামি যে খোঁটা কোনোদিন দিতে পারে নি আজ তাই শুনতে হল নাতির মুখে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পরেশ বেরিয়ে গেল। সনাতন নাকি তার ছোটো চাকের বদলে বড়ো চাক খুঁজছে। দামে পটলে পরেশ বিক্রি করে দেবে তার চাক। চিন্তেও বেরুল। একবার সন্নোর কাছে যাবে। বাড়ি নিঝুম হতে অন্নমণি ঝুপড়িতে উঠে গেলেন আস্তে-আস্তে। তক্তাপোশের তলা থেকে হাতড়ে-হাতড়ে বার করলেন রঙচটা তোবড়ানো প্যাঁটরাটা। পঁদারি সরনজাম। রঙের কৌটা, তুলি, পিছনে কাপড়ের জালি লাগানো মোটা কাগজ, নকশা-

আঁকা ট্রেসিংয়ের বাণ্ডিল। পুতুল গড়ার সাথে-সাথে অন্নমণি শিখেছিলেন পোটোর কাজ। বাপের ভিটের পাশেই থাকত রেজাউল চিত্রকর। অন্নকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল ছবি আঁকা। গাজীর পট। সত্যপীরের পট। মনসামঙ্গল। রাবণবধ। সাহেবপট। কলি-যুগের নানান কেচ্ছা। বিয়ের পর শ্বশুর বারণ করে-ছিলেন পট আঁকতে। পটিদারি নাকি মুসলমানি কাজ। রেজাউল চাচার মতে অবশ্য চিত্রকররা বিশ্ব-কর্মার বংশধর। নবাবি আমলে প্রাণ বাঁচাতে মুসল-মান হয়ে যান। শ্বশুরের হুকুমে পট আঁকা ছেড়ে দিলেও অন্ন কিন্তু পটিদারি সরনজাম ফেলে দেন নি। প্রতিমার চালচিত্র আঁকতে কাজে লাগাতেন। পট আঁকা ছেড়েও পটিদারি ভুলতে পারেন নি অন্নমণি।

পুতুল বানানোর অনেক হাঙ্গামা। মাটি কাটো; ছানো; ঠাসো; আঙুল দিয়ে আদল গড়ো; নরুনে কেটে চোখ, মুখ, কাপড়ের ভাঁজ, গয়না সব ফুটিয়ে তোলো; ভাঁটিতে পোড়াও; রঙ করো। তবে গিয়ে তৈরি হল তোমার পুতুল। অশক্ত শরীর আজ আর এত হ্যাপা পোয়াতে পারে না। তাই পটিদারিতেই শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান অন্নমণি। ঝুলনদৃশ্যের খসড়া একটা পেনসিলে আঁকাই ছিল। এবার তুলি দিয়ে তৈরি হবে সরু মোটা কালো রেখার মায়াজাল। ফাঁকা জমিগুলো ভরাট হবে রঙে। শ্যামলাঙ্গ কৃষ্ণের পীত বসন, নীলাম্বরীপরা রাইকিশোরীর দুধে-আলতা অঙ্গ। নজরকাড়া রঙের চমকদার খেলা।

'ও ঠাকমা, কী করচো?' সন্ধোর বাড়ি থেকে ফিরেছে চিন্তে। চোখে বিস্ময়ের ঘোর। 'আঁকতেচি। হাই বউ, তুই তো বারাইপুর যাস। আমি মেলা পট এঁকে দেব। তুই রেজাউল চাচার মতো ইসটিশানের রেলিঙে ঝুলিয়ে দিবি নাগাড়ে। দেখবি বাবুভেইরা ফটাফট কিনে নিবে।' ঠাকমার ঘোলাটে চোখে আশার আলো দপদপ করছে, 'দেখবি কোনো খাটা-খাটনি নাই। মাতায় চালের বস্তা বইতি হবে না। কেবল পট বেচবি আর নগদ পয়সা গুনে দিবি।' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না চিন্তে। বুড়ির নজর চলে না। কাঁপা হাতে হিজিবিজি রঙ আর কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লাইন ছড়িয়ে বলছে পট এঁকেছি। এই পট 'বিকুতে' হবে বারুইপুর স্টেশানে! ছাপা ক্যালেনডারের রাজেশ খান্না, হেমা মালিনীর ঝকঝকে 'ফুটুক' ছেড়ে বাবুভেইরা নাকি ফটাফট কিনে নেবে এইসব ছাইপাঁশ! চিন্তের হাসির শব্দে চমক ভাঙে অন্নমণির। পট ওতরায় নি। আসানবিবির কাছে তাঁর প্রার্থনা বিফল হয়েছে। চোখের যত কাছে কাগজ ধরলে নজর চলে, তাতে তুলি চলে না। আবার যতদূর ধরলে তুলি চলে, তত দূরে সব দেখায় ঝাপসা, ছায়াছায়া। নীলে কালোতে সবুজে ফারাক করা যায় না। পটিদারি সরনজামের ভাঙা প্যাঁটরাটা জানলা গলিয়ে পিছনের আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে দিলেন অন্নমণি। তারপর হাতড়ে হাতড়ে নেমে গেলেন পুকুর-পাড়ে আসানবিবির 'থানে'।...তেলসিঁদুরমাখানো বটগাছের গোড়াটায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন অন্ন। গড় করছেন আসানবিবিকে। 'মা, আমি ভাঁটি ছেড়ে যাবুনি। তুমি তো ভাঁটির মা, বলে দাও ক্যামন করে হবে এ মুশকিল আসান।'...রাত বেড়ে চলেছে গুমরে গুমরে।

চাল বেচার তাড়া নেই। তবু রাত থাকতে উঠে পড়েছে চিন্তে। 'খুব সকালা খেয়ে ট্রেন ধরতি হবে পলতার। ইদিকে সব রেডি। মুশকিল শুধু ঠাকমারে নে।' বুড়ির ধনুর্ভঙ্গ পণ, 'ভিটে ছেড়ে যাবুনি।' ঠাকমার ঝুপড়িতে ঢুকে অবাক হয় চিন্তে। বিছানা খালি। তবে কি মত পালটালেন অন্নমণি? দিদি-শাশুড়ির কষ্ট বোঝে চিন্তে। ভিটেমাটি ছেড়ে, বন্ধুদের ছেড়ে যেতে তারও কি কষ্ট হচ্ছে না? উপায় কী? পেটে যে এসেছে তাকে বাঁচাতে হলে, মানুষ করতে হলে আর তো কোনো পথ নেই। বাহাত্তুরে মানুষ ঠাকমা। অত বিচারবুদ্ধি নেই। কিন্তু দেশছাড়ার দুঃখটা কারু থেকে কম নয়। করুণাভরা মনে দিদি-

শাশুড়িকে খোঁজে চিন্তে। চাকতলা, গোয়াল, পাক-ঘর, বাঁশঝাড়, পুকুরপাড়। খুঁজতে-খুঁজতে পুকুরঘাটে আসানবিবির থানে এসেই বীভৎস ভাবে চিৎকার করে ওঠে পরেশের বউ। সকলের সব মুশকিল আসান করে ডাল থেকে ঝুলছেন অন্নমণি বেওয়া। আসানবিবির থানের ঠিক ওপরেই।

ত্রিপুরার উপজাতিসমস্যা

সমরেন্দ্র চৌধুরী

সমাজতত্ত্ববিদেরা ভারতের উপজাতি বা জনজাতি সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে আলোচনা করছেন। গত শতাব্দীতে হার্বার্ট স্পেনসারের মতো মনীষীও ভারতের উপজাতিসমূহের অনেক গুণের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। যেমন, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক সহযোগিতা, নারীর মর্যাদারক্ষা, শিশুদের সস্নেহ পরিচর্যা ইত্যাদি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উপজাতিদের সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, গবেষকদের কৌতূহলও বেড়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে উপজাতিদের নিয়ে সমস্যাও দেখা দিয়েছে বহুবিধ। ত্রিপুরার উপজাতিসমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তার আগে ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে সূত্রাকারে দু-একটি কথা বলা দরকার।

ইতিহাসের পটভূমি

ত্রিপুরা ভারতের দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অঙ্গরাজ্য। রাজ্যটি আকারে ছোটো, আয়তন দশহাজার চারশো একানব্বই বর্গ-কিলো-মিটার এবং বর্তমান লোকসংখ্যা বিশ লক্ষের কিছু বেশি। ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও ত্রিপুরার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। ত্রিপুরা তিনদিকে বাংলা-দেশকর্তৃক বেষ্টিত। একটি অংশ আসাম ও মিজোরমের সন্নিহিত, এবং আসামের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা স্থলপথে ভারতের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরার সীমান্ত থেকে ব্রহ্ম-দেশের সীমান্ত খুব দূরবর্তী নয়। ত্রিপুরার পথঘাট খুব উন্নত না হওয়ায় এবং রেলপথের সংযোগ প্রায় না থাকায় ত্রিপুরার অধিবাসীদের বিমানপথে বাংলা-দেশের উপর দিয়ে কলকাতায় আসতে হয়।

অতীতে ত্রিপুরার নাম ছিল ত্রিবেগ। ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের চন্দ্রবংশসম্ভূত বলে দাবি করেন, এবং যযাতির পুত্র দ্রুহ্যকে তাঁদের আদিপুরুষ বলে নির্দেশ করে

থাকেন। রাজবংশের আদিপুরুষদের যে তালিকা দেওয়া হয় তা অনৈতিহাসিক। ত্রিপুর রাজবংশের প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় মাণিক্যবংশের অভ্যুত্থানের পর থেকে। মহামাণিক্য (ছেয়াংফা) থেকে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য পর্যন্ত চল্লিশজন শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ হিসাবে প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করতে পারি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে।

ত্রিপুরার রাজারা প্রথমত আসামের একটি অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখান থেকে কালক্রমে কাছাড় হয়ে বর্তমান ত্রিপুরারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাঁরা বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন এবং শৌর্যেরও পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু অনেক বারই ভাগ্যবিড়ম্বিত হন। ব্রিটিশ শাসনে ত্রিপুরা অন্যান্য দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা কিছুটা বেশি স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ভোগ করত বলে দাবি করা হয়।

ত্রিপুরার শেষ নরপতি মহারাজা বীরবিক্রম-কিশোর মাণিক্য ভারত স্বাধীন হবার অনেকদিন আগে লোকান্তরিত হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমত ত্রিপুরাকে একটি গ-শ্রেণীর রাজ্য বলে গণ্য করা হত। পরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে পরিগণিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

ত্রিপুরার অধিবাসী

কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, 'ত্রিপুরাজ্যবাসীদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত বাঙালী, দ্বিতীয়তঃ লৌহিত্য বংশজ।' তিনি বলেন, তুই-প্রা বা তিপ্রাগণ চার শাখায় বিভক্ত। যথা, তিপ্রা, জমাতিয়া, নওয়াতিয়া ও রিয়াং। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে উনিশটি উপজাতিকে ত্রিপুরার অধিবাসী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরা হল: (১) ত্রিপুরী, (২) জমাতিয়া, (৩) নোয়াতিয়া, (৪) রিয়াং, (৫) উছাই, (৬) হালাম, (৭) চাকমা, (৮) মগ, (৯) কুকি, (১০) গারো, (১১) ছাইমল, (১২) লুসাই, (১৩) খসিয়া, (১৪) ভুটিয়া, (১৫) লেপচা, (১৬) মুণ্ডা, (১৭) ওরাওঁ, (১৮) ভীল, (১৯) সাঁওতাল।

ত্রিপুরীদের প্রধান দুটি ভাগ—পুরানো ত্রিপুরী, নূতন ত্রিপুরী (১৯৫১ সালের জনগণনায় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি)। অধিকাংশ ত্রিপুরী পাহাড় এলাকায় বাস করেন।

রিয়াংদের দুটি প্রধান শ্রেণী—মেচকা, মালসাই। রিয়াংদের মুখ্য দেবতা—মতইএতর, তুইমা, সাঙপ্রামা, খুলুমা, মিনলংমা, বুড়ুইরাগু, লাম্প্রা।

জমাতিয়াদের ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের একটি অংশ বলে গণ্য করা যায়। ত্রিপুর রাজাদের সৈন্যবাহিনী প্রধানত জমাতিয়াদের নিয়ে গঠিত হত।

উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চাকমাদের স্থান চতুর্থ। এদের একটি বড়ো অংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু চাকমার বাস।

হালামরা ছিল মূলত কুকিদের একটি শ্রেণী। অধিকাংশ হালাম শাক্ত, কিন্তু কলই এবং রূপিণীরা বৈষ্ণবধর্মানুরক্ত।

নোয়াতিয়াদের সঙ্গে জমাতিয়াদের সাদৃশ্য আছে এবং এদেরও বৃহত্তর ত্রিপুরী সমাজদের শাখা বলে ধরে নেওয়া যায়।

মগরা ছিল মূলত আরাকানের অধিবাসী। এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে।

ত্রিপুরায় কিছু-কিছু গারো অনেক দিন ধরে বাস করছে।

লুসাই এবং কুকিরা প্রকৃতপক্ষে একই কুলোৎপন্ন। এদের মধ্যে পনেরোটি শাখার সন্ধান পাওয়া যায়।

ছাইমলরা কুকিদের অন্যতর শাখা।

খাসিয়া ভুটিয়া লেপচা মুণ্ডা ওরাওঁ ভীল সাঁওতাল—এদের আলাদাভাবে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুরী চরিত্র

কৈলাসচন্দ্র সিংহ "রাজমালা"য় বলেছেন, 'তিপ্রা-জাতির স্বভাব মধুর, সুন্দর ও সারল্যপূর্ণ। ইহারা দুর্দান্ত কুকিদিগের ন্যায় শ্বাপদপ্রকৃতিসম্পন্ন না হইলেও ভীরু নহে। পরদুঃখে ইহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। কাপট্য ইহাদের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। ইহাদের হৃদয়ের প্রফুল্লভাব সর্বদা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেসকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা মনুষ্য ক্রূর ও পশুভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদিগের মধ্যে সেই-সকল কুপ্রবৃত্তি প্রায় দৃষ্ট হয় না। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে ইহারা তাহা প্রাণান্তেও লঙ্ঘন করে না। ইহারা স্বাবলম্বী, পরের গলগ্রহ হওয়া ইহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক। ইহাদের একতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহারা আশুতুষ্ট আশুরুষ্ট জাতি, তদ্ব্যতীত ইহাদের প্রতি অন্য কোনরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারিগণের সংসর্গে তিপ্রাজাতির দেবতুল্য চরিত্র ক্রমে স্খলিত হইতেছে।'

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও ত্রিপুরীদের এই উদারতা দেখে অন্য অধিবাসীরা মুগ্ধ হতেন। আজ ওঁদের প্রকৃতিগত মাধুর্য অন্তর্হিত হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে উপজাতিসমস্যার মূলে যেতে হবে।

উপজাতিসমস্যার নানা রূপ

উপজাতিসমস্যা কিন্তু সব অঞ্চলে একরকম নয়। নাগাল্যানডের সমস্যা এবং অরুণাচলের সমস্যা পৃথক ধাঁচের। মণিপুরের উপজাতিরা যে সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন, মেঘালয়ের উপজাতিদের সংকট তার অনুরূপ কি? আসামে এখনো বহু উপজাতির বাস। সেইসব উপজাতি (তা পাহাড়ের বাসিন্দাই হোক, আর সমতলবাসীই হোক) যে অধিকারের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে তার সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতিদের আন্দোলন সম্পূর্ণ মিলবে না।

আসল কথা, এক-একটি উপজাতি উন্নতি আর বিকাশের এক-একটি স্তরে উপনীত হয়েছে। সেজন্য তাদের সমস্যাগুলিও একরকম নয়। মেঘালয়ের অধিবাসীরা শিক্ষাদীক্ষা এবং আর্থিক উন্নতির যে স্তরে আরোহণ করেছেন, তার সঙ্গে অরুণাচলের অধিবাসী-কোনো তুলনা করা অসংগত।

ভেরিয়ার এলউইন প্রাক্তন "নেফা" অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচলের উপদেষ্টা হয়ে যখন আসেন তখন তাঁর সামনে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল—কী করে উপজাতিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের বৃহত্তর জনজীবনের স্রোতের সঙ্গে এবং বর্তমান কালের সঙ্গে তাদের ঐক্যসাধন করা যায়। উপজাতিদের জাদুঘরের সামগ্রী করে রাখা চলবে না। আবার ভিন্নতর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তারা যেন নিজেদের স্বভাব এবং ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হয়।

ত্রিপুরীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা খুব বড়ো সমস্যা নয়। কারণ তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বাঙালিদের সঙ্গে মিলে সাংস্কৃতিক লেনদেনে অভ্যস্ত। তাঁদের সমস্যা অন্য প্রকারের। মূলত তা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ত্রিপুরীদের অভিযোগ

ত্রিপুরীদের ক্ষোভের প্রধান কারণ বহিরাগত বিশেষত বাঙালিদের প্রচুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ব্যবসায় ও চাকুরি-ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ। ১৯৩১ সালে ত্রিপুরার সমগ্র জনসংখ্যা ছিল ৫,৮২,৪৫০। ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৪২,০০৫। ১৯৩১-এ বঙ্গভাষীর সংখ্যা ছিল ১,৬৫,৫৩০। ১৯৬১ সালে তা হয় ৭,২২,৪৪২। পক্ষান্তরে এই দুই বছরে ত্রিপুরীর সংখ্যা হয়েছে ১,৪৮,২৯৮ থেকে ২,১১,৮৮৩। গত দুই জনগণনায় বাঙালির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে আরো বেড়েছে—ত্রিপুরীদের সংখ্যাবৃদ্ধি সে তুলনায় গৌণ।

ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট এই বাঙালিদের অধিকাংশ শরণার্থী। এঁরা দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি এলাকায়ও বসতি স্থাপন করেছেন। ত্রিপুরার উপজাতিরা মনে করেন, উপনিবিষ্ট বাঙালিরা ছলেবলেকৌশলে তাঁদের বহু জমি হস্তগত করে নিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রিপুরীদের প্রায় কোনো স্থানই নেই। চাকুরির ক্ষেত্রে লোভনীয় সমস্ত পদ বাঙালি আর অন্যান্য বহিরাগতদের দখলে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাঁরা অধিকাংশ দরিদ্র, এবং অসম প্রতিযোগিতার ফলে কোণঠাসা। এমন-কি, উপজাতিদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেরও সুস্থ বিকাশ ঘটছে না।

এই অভিযোগ যে বহুলাংশে সত্য, তাতে সন্দেহ নেই। শরণার্থীদের অনেকের অল্প সময়ে অর্জিত বিপুল বিত্ত দেখে তা বোঝা যায়। ত্রিপুরার সর্বত্র যে চোরা-কারবারিদের প্রতাপ তারা বাঙালি সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

উপজাতিদের এই ক্ষোভ গত দুই দশক ধরে ঘনীভূত হচ্ছে। বছর বিশেক আগে সেংক্রাক নামে একটি দল গঠিত হয়। এরপর গঠিত হয় ত্রিপুরা উপ-জাতি যুব সমিতি (টি-ইউ-জে-এস)। সাম্প্রতিক কালে উগ্রপন্থী দল ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স (টি. এন. ভি)-র কার্যকলাপ পত্রিকা পাঠ করলে রোজই জানা যায়।

অভিযোগ-সমীক্ষা

এই অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে দেখবার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। ত্রিপুরায় বাঙালির বসবাস কয়েক শতাব্দী যাবৎ। অন্তত দুশো বছর ধরে তাঁরা রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন। ত্রিপুরার মহারাজারা বাঙালিকে সাদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। উচ্চপদে অনেক বাঙালিকে তাঁরা নিয়োগ করেন। এমনকি জমিচাষের জন্যও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বহু বাঙালি চাষীকে তাঁরা এনে চাষবাসের সুযোগ দেন। এরা ছিল 'জিরাতিয়া' প্রজা। রাজ-কার্যে মহারাজারা সর্বদা বাঙলা ভাষা ব্যবহার করতেন। কোনো-কোনো মহারাজা প্রকৃত সংগীত-কুশলী ছিলেন, তাঁরা বাঙলায় গানের বইও লিখেছেন। যদুভট্ট থেকে ওস্তাদ আলাউদ্দীন পর্যন্ত বহু গুণী বাঙালি গায়ক রাজদরবারের অনুগ্রহপুষ্ট হন। মহা-রাজা বীরচন্দ্র তরুণ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে সমাদরে আমন্ত্রণ জানান তার ইতিহাস সুবিদিত। কবি হেম-চন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বনামধন্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি কত বাঙালি মনীষী মহারাজাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তা বলবার নয়। যে রাজ্যে বাঙালিরা এত দীর্ঘকাল যাবৎ সম্মানের সঙ্গে আসীন তাঁদের হঠাৎ কৌশলে অনুপ্রবেশকারী বলা সমীচীন হবে কি?

বাঙালি শরণার্থীর বক্তব্য, ত্রিপুরাকে উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে তাঁরাও গত চল্লিশ বছরে কম পরিশ্রম করেন নি। যেসব এলাকা একান্ত দুর্গম আর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল সেখানে প্রাণের ভয় জয় করে বুনো হাতির মুখোমুখি হয়ে তাঁরা তাকে ফলোৎপাদী করে তুলেছেন। এখন তাঁদের উৎখাত করার চেষ্টা অন্যায়।

সত্যের খাতিরে বলা কর্তব্য, মহারাজাদের আমলে তাঁদের আয়ের একটি বড়ো অংশ আসত তাঁদের জমিদারি (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) চাকলা রোশনাবাদ থেকে। ত্রিপুরায় তাঁদের মুখ্য আয় ছিল জঙ্গলের কাঠ আর হাতি বিক্রয়। ত্রিপুরার বৈষয়িক উন্নতির দিকে তাঁরা তেমন নজর দেন নি। আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ মার্টিন কোমপানির তৈরি। শোনা যায়, সেই সময় মার্টিন কোমপানি ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ছোটো রেললাইন চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মহারাজারা তাতে উৎসাহী হন নি।

ত্রিপুরীদের অনুন্নত অবস্থার জন্য শুধু য়রণার্থীরাই কি দায়ী ?

উপজাতিদের বক্তব্য

শরণার্থীদের উক্তি কিছুটা সত্য হলেও উপজাতিদের অভিযোগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপজাতিদের জমি যে প্রচুর বেদখল হয়েছে (এবং নামমাত্র মূল্যে) তা শহরগুলির দিকে তাকালেও উপলব্ধি হয়। এই কারণে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল, তা বিস্ফোরণের মতো দেখা দেয় ১৯৮০ সালের ভীতিপ্রদ দাঙ্গায়। সেই দাঙ্গায় বাঙালি-ত্রিপুরী উভয় সম্প্রদায়েই বহু মানুষ নিহত হন। মান্দাই নামে একটি বাজারে কয়েক শ বাঙালি প্রাণ হারান। মান্দাইয়ের ঘটনা আকস্মিক নয়। এ এক ভ্রান্ত সরকারি নীতির বিষময় ফল। মান্দাই আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল একান্তভাবে উপজাতি-অধ্যুষিত। এই উপজাতি বসতিতে ভাঙন ধরাবার জন্য তার একটি বড়ো অংশ অধিগ্রহণ করে সেখানে ইনজিনীয়ারিং কলেজ নির্মিত হয়। (এরকম যাতায়াত-সুবিধাহীন জনবিরল এলাকায় স্থাপিত হওয়ার ফলে ইনজিনীয়ারিং কলেজটিও প্রথম থেকে পঙ্গু।) মান্দাই বাজারও ক্রমে-ক্রমে বাঙালি ব্যবসায়ী আর মহাজনদের মুঠোয় চলে যায়। এরই পরিণাম মান্দাইয়ের নরমেধ।

দাঙ্গার সময়েও মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছিল। শুনেছি, উদয়পুর-সন্নিহিত একটি অঞ্চলে প্রচুর উপজাতিকে হত্যা করা হয়। কেবল দুজন বেঁচে যায়। দুজনের বেনামিতে অ-উপজাতি ব্যক্তিরা উপজাতিদের জমি কিনতেন। তাই এঁদের বাঁচিয়ে রাখা!

দাঙ্গা না ঘটলেও উপজাতি-অ-উপজাতির পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ঘৃণা বাড়তই। বিশেষ করে ছাত্র- ও যুব-সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হয় গভীর। প্রচুর উপজাতি ছাত্র শিলঙ ও অন্যান্য এলাকায় মিশনারি বিদ্যায়তনে পড়তে যান। অনেকে খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করেন। ওঁদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের বীজ সুনিপুণভাবে বুনে দেওয়া হয়। বিশেষ করে মিজো সহপাঠীদের প্ররোচনা ছিল। (স্মরণ রাখতে হবে, টি-এন-ভির অধিনায়ক বিজয় রাংখল লুসাই-মিজো সম্প্রদায়ভুক্ত, খ্রীষ্টান ও শিলঙে শিক্ষাপ্রাপ্ত।)

প্রতিকারে সরকারি প্রচেষ্টা

উপজাতিদের ক্ষোভপ্রশমন ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য সরকার থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(ক) ১৯৮২ সালে স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (Autonomous District Council) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ক্ষমতা খুব বেশি না হলেও ক্রমে বাড়বে। নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৮ জন।

(খ) অ-উপজাতি ব্যক্তি, উপজাতি ব্যক্তির জমি কিনতে পারে না। কিনতে হলে জেলা-শাসকের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হয়।

(গ) চাকরির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। উপজাতিরা পাবে ২৫ শতাংশ ও তপশীল শ্রেণীর লোকেরা ১৫ শতাংশ চাকরি। লোকসংখ্যার আনুপাতিক হারে এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) উপজাতিসমূহের ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ককবরক ভাষায় শিক্ষাদান ও গ্রন্থরচনা চলছে। বহুপূর্বে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা "কক বরকমা" নামে একটি বই লিখেছিলেন—তারপর আর কেউ এদিকে মনোযোগ দেন নি। এখন ককবরকে প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়, পত্রিকাও আছে। আকাশবাণীতে ককবরক ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করা হয়, ত্রিপুরী সংগীতও প্রচারিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া উপজাতির নিজস্ব নৃত্যকলা ও কারুশিল্প যথেষ্ট সমাদর পাচ্ছে।

জুম-চাষ

স্মরণাতীত কাল থেকে পাহাড়ের অধিবাসীরা জুম-চাষে অভ্যস্ত। কিন্তু জুম-চাষ মাটির অবর্ণনীয় ক্ষতি করে। সেইজন্য উপজাতিদের জুম-চাষে নিবৃত্ত করে সমতলভূমিকে কৃষিকাজে বা অন্য কোনো বৃত্তিতে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু পাহাড়ে-পাহাড়ে বিচরণশীল জুম-চাষীকে সমতলে এনে প্রতিষ্ঠিত করানো এবং ভিন্ন ধরনের ঘরে থাকতে অভ্যস্ত করানো সুকঠিন কাজ।

সরকারি প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া

উপজাতিদের আস্থা অর্জনের জন্য পূর্বোক্ত সরকারি প্রয়াসগুলি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। (কোন্ সরকার কী কাজ করেছেন এবং কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী সরকারের কর্মপ্রণালী এবং কুকর্মপ্রণালীতে এত সাদৃশ্য যে এদের কাজের আলাদা ফিরিস্তি দেওয়া নিরর্থক।)

কিন্তু এই-সকল প্রচেষ্টায় অনেকেই রুষ্ট হয়েছেন, যা অস্বাভাবিক নয়। ধরা যাক চাকরির সংরক্ষণ-নীতি। এ কাজ বহু আগে করা উচিত ছিল। সরকারের উদ্যোগ বিলম্বিত হওয়ায় অনেকেই একে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। কেবল ত্রিপুরা নয়, গুজরাত-মধ্যপ্রদেশেও একই কারণে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। কোথাও-কোথাও সরকারের অত্যুৎসাহী আমলারাও চাকরি সংরক্ষণে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়ে মানুষের বিদ্বেষ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কোনো-কোনো মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাও বাড়াবাড়ি করছেন।

এ বিষয়ে দু-একটি কথা বিবেচ্য। নিচুবর্গের পদে উপজাতি প্রার্থী পাওয়া দুষ্কর নয়, এবং সাধারণ শিক্ষিত উপজাতি যুবকের মধ্যে বেকার আজকাল প্রায় নেই। কিন্তু কিছু-কিছু উচ্চপদে, বিশেষ করে যাতে বিশেষজ্ঞতা প্রয়োজন, উপজাতি প্রার্থী সুদুর্লভ। এমন কি ২০ বছরেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এসব পদ বাধ্য হয়ে খালি রাখতে হয় (ক্যাবিনেট মিটিঙে এই পদগুলিকে de-reserve করানো মুখের কথা নয়)। আবার পদ খালি থাকলে অর্থসচিবকে দিয়ে বাড়তি পদ মনজুর করানোও অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট প্রতিষ্ঠানে হয়তো অসুবিধা হয় না। কিন্তু ছোটো-ছোটো রাজ্যে প্রশাসকেরা বিপাকে পড়েন।

দ্বিতীয়ত, চাকরি ও স্কুল-কলেজে আসনলাভ সুনিশ্চিত হওয়ায় উপজাতিভুক্ত যুবকদের মধ্যে উদ্যমহীনতা লক্ষিত হচ্ছে। মেডিক্যাল বা ইনজিনীয়ারিং কলেজে উপজাতি ছাত্র পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে তার জন্য বিশেষ কোচিঙের ব্যবস্থা করতে হয়। এর ফলে অনেকের মধ্যে উন্নতি করার কঠিন সংকল্প দেখা যায় না। এমন কি, উপজাতি চাষীরাও অনেকে একান্তভাবে সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে।

তৃতীয়ত, অ-উপজাতি ও অ-তপশীলি শ্রেণীর মধ্যে অনেক ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয়ে ও কৌশলে উপজাতি বা তপশীলী শ্রেণীর পরিচয়পত্র বা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করছেন। তপশীলি বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে চাকরি লাভের জন্য আই-এ-এস অফিসারও বরখাস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে কোনো-কোনো সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের (ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির) সুবিধালাভের জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন। মণিপুরীরা আগেই পশ্চাৎপদ শ্রেণী বলে গণ্য হবার দাবি জানিয়েছিলেন। এখন ত্রিপুরার বিরাট নাথ সম্প্রদায়ও এই দাবি আদায়ে উদ্যত। এদের সবার লক্ষ্য উপজাতির মতো সুবিধাভোগ।

সমাধানের পথ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে ব্যবধান দেখা দিয়েছে তার অবসান ঘটানোর জন্য রাতারাতি ফল-

প্রদ কোনো ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘকালের ধীর অনলস চেষ্টায় শুধু সমাধান করা যায়। মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরার ভূমিতে উপজাতি-অউপজাতি দুই সম্প্রদায়ই দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতি যথার্থই মিশ্র সংস্কৃতি। একথা ভুলে গিয়ে ভোট আদায়ের জন্য বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বী হলে কোনোদিনই বিরোধের অবসান হবে না। (ভোট আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সব কাজই করতে পারেন। জোটবদ্ধ নয় বলে আজ যে বিচ্ছিন্নতাবাদী, জোটবদ্ধ হলে কালই সে প্রগতিশীল! মুসলিম ভোটারকে খুশি করার জন্য স্কুল না খুলে সেকেলে মাদ্রাসা খোলা যায় রাশি-রাশি!) কিন্তু এই সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতলবের দ্বারা কোনো সম্প্রদায়েরই উপকার হবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের জন্য জনগণের মধ্যে চেতনা আনা আবশ্যক। রাজনৈতিক দলগুলিকে একাজে অগ্রণী হতে বলা আর চিতাবাঘকে তার গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ একই কথা। সকল সম্প্রদায়ের সৎ এবং বিবেকবান ব্যক্তিরা সচেতনতা এবং আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে বিরোধের কাঁটা দূর করতে সক্ষম হবেন।

এক প্রমত্ত জোয়ান কাব্যবীজ, এক অভিনব ব্রতকথা

কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার—বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। নবার্ক, কলকাতা। পঞ্চাশ টাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা—তানভীর মোকাম্মেল। মুক্তধারা, ঢাকা। পয়তাল্লিশ টাকা, বত্রিশ টাকা।

১৩৫৮ সালে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় কমলকুমারের একটিমাত্র গল্পকে কেন্দ্র করে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় কমলকুমার-চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর কমলকুমারকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা, স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই বাঙলায় প্রথম বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত কমলকুমারকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। কয়েকটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্রে অথবা বিভিন্ন পত্রিকায় ও সঙ্কলনগ্রন্থে বিচ্ছিন্ন আলোচনা প্রকাশ করার মধ্যেই আমাদের কমলকুমার-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। "কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার" প্রকাশ করে বীরেনবাবু বিচ্ছিন্ন কমলকুমার-চর্চার লজ্জা থেকে মুক্তি দিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি একটি গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। ওপার-বাঙলায় রফিক কায়সার "কমলপুরাণ" লিখে কত আগে সেই দায়িত্ব পালন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

মানিক-পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে কমলকুমারের ভূমিকা, ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা রূপায়ণে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যে কমলকুমার-সৃষ্ট কথাসাহিত্যের তাৎপর্য বা গুরুত্ব কোন্‌খানে এখনও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি। মৃত্যুর সাত বছর পরও এটা লেখক হিসেবে কমলকুমারের দুর্ভাগ্য।

"বাংলা উপন্যাসের ধারা এবং কালান্তর" নামের বিশাল গ্রন্থে কমলকুমার নিদেন একটি পৃষ্ঠাও পান না কথাসাহিত্যিক হিসেবে! আর যাঁরা কমলকুমার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁদের এক শ্রেণীর কাছে কমলকুমার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হন 'একান্ত আধুনিক এবং একান্ত ভারতীয় একটি মহৎ শিল্পপ্রতিভা তীব্রভাবে ঔপনিবেশিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়লে যে কতোটা ভারসাম্য হারাতে পারে তার এক চরম নিদর্শন' হিসেবে।

গ্রন্থসমালোচনা

অথবা তাঁকে, তাঁর সাহিত্যকে নির্দিষ্ট করেন প্রগতিবিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী, এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে। হয়তো এটা করতেই হয় তাঁদের, কেননা একা কমলকুমার বাঙলা ভাষাকে যে স্বাবলম্বন এবং ধারণক্ষমতা দিয়েছেন তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টা তার ধারেকাছেও পৌঁছোয় না। ফলে যেভাবে আমরা ভাষাকে ক্রমে সংবাদপত্রমুখী এবং কাহিনী-বলার উপযুক্ত করে তুলেছি, তাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, কমলকুমারকে আঘাত করা ছাড়া উপায় নেই। সে যাই হোক, তাঁদের মিলিত অপচেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, কমলকুমারের ভাষায় যে ইতিবাচক দিকগুলি আছে, তা অনুসরণযোগ্যও—এটা আজ প্রমাণিত সত্য। যাঁরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পড়েছেন, তাঁরা আঁচ করতে পারছেন ব্যাপারটা। আর-এক পক্ষ কমলকুমারের যথার্থতা নিরূপণে সচেষ্ট; টেনে-টেনে দেখাতে চান তাঁর রচনার রত্নগুলিকে যাঁরা, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁদের একজন।

২৬০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে সংকলিত হয়েছে সাতটি প্রবন্ধ। কমলকুমার-বিষয়ক অন্তত চার-পাঁচটি প্রবন্ধ এখনো নানা পত্র-পত্রিকার পাতায় বন্দী। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এখনো লিখে চলেছেন গবেষকের নিষ্ঠায়। সংকলিত প্রবন্ধগুলি একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কমলকুমার-মূল্যায়নের কতকগুলি মৌলিক অসুবিধা রয়েই গেছে আজ পর্যন্ত। কোনো লেখকের সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জী ছাড়া কোনোভাবেই সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কমলকুমার কতগুলি গল্প-উপন্যাস রচনা করেছিলেন, কেমন ছিল প্রস্তুতির পর্যায়গুলি—এসব আজ রহস্যাবৃত,—হয়তো চিররহস্যাবৃতই। "কালই আততায়ী", "শ্যামনৌকা", "আমোদ বোষ্টমী", "আমোদিনী কথা," "খেলা ও বাগান" সিরিজের আরও অন্যান্য গল্পগুলি—যার কথা তিনি চিঠিতে নানা জনকে জানিয়েছিলেন—কোথায় গেল? বা কোথায় গেল "রবিবাসর" ১৩৯০-এ প্রকাশিত "শবরীমঙ্গল" উপন্যাসের আর-একটি সংশোধিত পাণ্ডুলিপি যা সুব্রত চক্রবর্তী "এক্ষণ" ১৩৮৬ সালে অপ্রকাশিত রচনা নামে প্রকাশ করেছিলেন? কত নোট লিখেছিলেন পাণ্ডুলিপির ফাঁকে-ফাঁকে? ডায়েরি? চিঠিপত্র? সংশোধিত

খসড়ার পর খসড়াগুলি ?—জানি না আমরা। আদৌ জানতে পারব কিনা কে জানে !—এই-সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুদূর আসামে বসে বীরেনবাবু এই বইটিতে যেভাবে কমলকুমার আলোচনা করেছেন তা কমলপ্রেমিকদের কাছে, তাবৎ পাঠকসাধারণের কাছে, একটি অপূর্ব উপহার।

ফলে, এই বইয়ে কমলকুমারের বিকাশ-পরিণতির ধারাবাহিক কোনো স্তর নেই, অথচ সম্ভব ছিল ; অন্তত প্রকাশিত রচনাবলীর একটি ক্রমচিত্র এঁকে দিতে পারতেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন, গোটা তিনেক প্রবন্ধ বাদ দিতে হল, কিন্তু বইটির বিন্যাসে বীরেনবাবুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, তা স্পষ্ট। যেমন—"সুহাসিনীর পমেটম"র পূর্বেই "পিঞ্জরে বসিয়া শুক" উপন্যাসের আলোচনা-প্রবন্ধটির স্থান ; গল্পের কোনো বিশিষ্ট আলোচনার অভাব ; সব মিলিয়ে বইটি অগোছালো। "অনিলা স্মরণে" উপন্যাসেরও কোনো আলোচনা বা নির্দিষ্ট করে ওই উপন্যাসের স্থান কিংবা গুরুত্ব বিষয়েও কোনো ইঙ্গিত নেই। কমলকুমারের উপন্যাসধারায় ওই উপন্যাসটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে, অন্তত বিশিষ্ট লেখক কমলকুমারের একটি বিশেষ মানসিকতাকে ধারণ করে আছে ওই উপন্যাসটি।

কমলকুমারের মতো লেখকের আলোচনা কত ভাবেই না হতে পারে! এ ব্যাপারে বীরেনবাবুর সঙ্গে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত থাকতেই পারে। আমি আলোচনার দিকে না গিয়ে কতকগুলি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

বীরেনবাবু ১০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'উপন্যাসের ভাষায়, কমলকুমার, অন্তর্জলী যাত্রা ছাড়া, আর প্রায় সর্বত্রই তাঁর গদ্যভাষায় ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছেন।—পিঞ্জরে বসিয়া শুক তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।' "পিঞ্জরে বসিয়া শুক"-এ হয়তো ভাষার চূড়ান্ত জটিল রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাসের ভাষায় কি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছেন ? কেননা "অন্তর্জলী যাত্রা" থেকে "খেলার প্রতিভা" পর্যন্ত উপন্যাসধারায় "সুহাসিনীর পমেটম"কে যদি তর্কের খাতিরে বাদও দিই, "অনিলা স্মরণে"র ভাষার সাধু ক্রিয়াপদগুলি তুলে নিলে কমলকুমারের গল্পসংগ্রহের যে-কোনো গল্প ভাষার থেকেও দুর্বল। ঐতিহ্যপ্রাণিত স্বচ্ছন্দ সাবলীল গদ্যভঙ্গি। আর যেটুকু কমলকুমারের স্বকীয় রচনারীতির বিশেষত্ব দেখা যায়, তা কমলকুমারের বহু-রচনা-অভ্যাস-সঞ্জাত। কমলকুমারের সাহিত্যে কি এমন খুকু-উপমা পাওয়া যাবে যে, অনিলা 'চাষাদের মত, বাঙালীদের মত, নেটিভদের মত কাঁদিয়া উঠিল।' (অনিলা স্মরণে, পৃ ৮৮) আমার মনে হয়, "গোলাপ-সুন্দরী" থেকে "অনিলা স্মরণে" কমলকুমারের কথাসাহিত্যে একটি বিশেষ পর্যায়। "সুহাসিনীর পমেটম" একটি দ্বীপ। বীরেনবাবু ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছিলেন, 'লেখক (কমলকুমার) স্বয়ং তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে স্থানবিশেষে হয়তো বা কিছু অন্যমনস্ক।' অন্যমনস্কই নয়, রীতিমতো সচেতনভাবেই এটা করেছেন। সিমবল এবং ইনটিউশনের ভেদরেখাতেই নয়, এই পর্বে শিল্পী কমলকুমার খানিকটা পাঠক, গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং সম্পাদক-রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। এটা অনুমান নয়, অতি বাস্তব। কমলকুমারকে লিখিত এবং কমলকুমার-লিখিত কয়েকটি চিঠি পড়লে বোঝা যায়।

"সুহাসিনীর পমেটম"র অনিঃশেষ বাক্য ব্যবহারকে কি অবচেতন অভিলাষে, গদ্যের এক উপচে-পড়া সারল্য ও নগ্নতার স্বয়ংপ্রকাশ বলে দেখা যায় ? ১৪৮-পৃষ্ঠাব্যাপী গদ্য-শরীরের অতুল বৈভব দেখে যে-কোনো পাঠকই হাঁইয়ে যাবেন, কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে কমলকুমার খানিকটা স্টানট দিয়েছেন, জেমস জয়েসের অনুকরণ করেছেন ? কেননা উপন্যাসটির যা বিষয়বস্তু তাতে চোখে-দেখা এই অখণ্ডতা বা অনিঃশেষ বাক্য ব্যবহার না করলেও চলত। এমনকি পূর্ণচ্ছেদ তো ব্যবহার করা যেতই, প্যারাগ্রাফও করা যেত। "সুহাসিনীর পমেটমে"র বিষয় "পিঞ্জরে বসিয়া শুকে"র চেয়ে জটিলও নয়, বহুমাত্রিকও নয় এবং "পিঞ্জরে বসিয়া শুকে"র ভাষার স্বাবলম্বনও "সুহাসিনী"তে নেই। অথচ "পিঞ্জরে বসিয়া শুকে" পূর্ণচ্ছেদব্যবহার সত্ত্বেও এক উপচে-পড়া সারল্য আর নগ্নতার স্বয়ংপ্রকাশ সঞ্চরণশীলতা বর্তমান। বিষয়রীতির একাত্মতার অভাব কি খুব বেশি করেই "সুহাসিনী"তে চোখে পড়ে না ?

কমলকুমারের ভাষারীতি নিয়ে বীরেনবাবু অনবদ্য আলোচনা করেছেন "সে ভাষা ভুলিয়া গেছি" প্রবন্ধে। কমলকুমার কোথায় পেলেন এমন গদ্যভঙ্গির আদর্শ এবং কেন রবীন্দ্রগদ্যের বিপরীত মেরুলোকে চলে গেল তাঁর গদ্যভাষা, এই দুটি মূল সমস্যার সমাধান করেছেন গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটিতে অনেক উদাহরণ দিয়ে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, চিরে-চিরে।

তবে এই অনবদ্য আলোচনাটির প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই : কমলকুমার "বাগান লেখা" প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কাব্যের অনুভব, শিল্পের গভীরতা, সঙ্গীতের আড়া, গল্প সম্পর্কে আমরা ব্যবহার করিব। গল্প ব্যতীত অন্যগুলির এ্যাবসারডিটি আছে (যেমন ছবিতে কাগজ ভেদ করা যায় না, উহা এক নিশ্ছিদ্র দেওয়ালবৎ অথচ কালিঘাট কাঙ্গড়ার ছবি দেখ—কি ব্যাপার ! কুরুবের ছবি দেখ ! কি বিশাল—রোদ, মেঘ, বাড়ি ঘর সব আসিয়াছে।) গল্পের এ্যাবসারডিটি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে' (লেখা বিষয়ক / জার্নাল সম্ভব ১৯৭৬)। ফলে গল্পে এই অ্যাবসার্ডিটি সন্ধানের জন্য কমলকুমার আজীবন অন্যান্য আর্ট-ফরমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর্ট-ফরমের দরজায়-দরজায় ঘুরেছেন। কমলকুমারের ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বাঙ্গক সিদ্ধি আবিষ্কারের জন্য ওই আর্ট-ফরমগুলির অনুসন্ধান প্রয়োজন। বীরেনবাবু এত দূর যান নি।

বীরেনবাবু ২৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে যা বলতে চেয়েছেন, মাত্র কয়েকটি বাক্যে মুখবন্ধে তাই স্পষ্ট করে বলেছেন। আসামের ১৯৮০-৮১ সালের আতঙ্কময়, অনিশ্চিত আর রুদ্ধশ্বাস দিনগুলিতে যখন উৎপীড়ন ঘৃণাবিদ্বেষ আর মানুষে মানুষে সন্দেহের কুটিল আবর্তের ঘনজাল, তখন তাঁর কাছে কমলকুমার-রচনাবলী ছিল পাথেয়, আশ্রয় ! এ-এক আশ্চর্য আবিষ্কার। যাঁর কাছে মানুষে মানুষে 'যোগাযোগের সেন্টিমেন্ট' আর 'এসথেটিক সুস্থতা' ছিল আরাধ্য, তাঁর জটিল রচনাবলী তো এক অর্থে বিচ্ছিন্নতারই নামান্তর। তাহলে কমলকুমার আশ্রয়ও হতে পারেন ! কমলকুমারের সাহিত্য যে কতটা সংলগ্নতা সাহিত্য তার তো জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতার ফসল "কাব্য-বীজ ও কমলকুমার মজুমদার" বইটি। কমলকুমার-চর্চার এক অপ-রিহার্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে এই বই। কমলকুমারকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন, এই বইটিকে কোনো-ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

মাত্র তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক আর বিশ-বাইশটা গল্প লিখে বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। বাঙলা সাহিত্যের লীডিং ঔপন্যাসিকদের হাতে মুসলমান সমাজের রূপ এখনো উদ্‌ঘাটিত হয় নি। ফলে মুসলমানদেরই তাঁদের সমাজচিত্রণের দায় তুলে নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আধা-সামন্ত বাঁধনে বাঁধা ; গ্রামীণ মুসলমান সমাজ কোনো শক্তিশালী ঔপন্যাসিক কলমের দ্বারা যেন আজো বিশ্লেষিত হবার অপেক্ষায়। তার খানিকটা ভূমিকা পালন করেছেন ওয়ালীউল্লাহ। এই বইটির সারা অংশে তানভীর ওয়ালীউল্লাহের ভূমিকা সন্ধান করেছেন সামগ্রিক উপন্যাসের শিল্প-বিশ্লেষণ এবং উপাদানবিশ্লেষণের মাধ্যমে। তৌলনপদ্ধতির সাহায্যে। খুঁজতে চেয়েছেন বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় এবং দ্বান্দ্বিকতায় ওয়ালীউল্লাহের স্থান কোথায়। এর ফলে তানভীর উপন্যাস আলোচনায় মার্কসীয় দর্শন, আন্তর্জাতিক মার্কসীয় সাহিত্যের উদাহরণ, প্রয়োজনে তুলনা, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা সংগত সেই প্রশ্ন তুলে-তুলে ওয়ালীউল্লাহের মূল্যায়ন করেছেন।

ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, প্রয়োজন দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। এর অভাব ঘটলে লেখক যতই শক্তিশালী হোন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাই তাঁর কপালে জোটে। বলা বাহুল্য, ওয়ালীউল্লাহের ছিল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশজ উপাদানের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। ব্যক্তিজীবনে সাধারণ জীবনযাত্রার বহু ঊর্ধ্বে বসবাস করেও, বিদেশে ফার-এলম-পাইন-পরিবেষ্টিত হয়েও দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার আনাচে-কানাচে। সাহিত্যের শুরু থেকেই চোর, ভিকিরি, দরজি, সারেং, মাঝি প্রভৃতি শ্রমজীবী বিত্তহীনদেরই চিত্রিত করেছেন। "লাল সালু", "চাঁদের অমাবস্যা" বই দুটি রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে-সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতাতেও তিনি প্রখর। তানভীরও বলেছেন, '১৯৪৮ পাকিস্তানোত্তর নতুন শাসকশ্রেণীটি মজিদের মতই এদেশকে "ইসলামী" সালু কাপড়ে ঢেকে তাদের শাসন-শোষণটা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল।' কিংবা "চাঁদের অমাবস্যা"য় ইয়াহিয়া খানের শাসনে সাধারণ মানুষের অসহায়তার রূপটিই চিত্রিত। আবার তিনিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পারীতে বসে সদ্য-উত্থিত জাতির পক্ষে পশ্চিমী জনমত গঠনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ওয়ালীউল্লাহ প্রায় সবক্ষেত্রেই সমাজবাস্তবতার চেয়ে ব্যক্তিমনের বিচিত্রতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, চরিত্ররা তেমন প্রতিবাদে

উচ্চকিত নয়। তবে দমবন্ধ-করা নৈরাশ্যময় সাহিত্যও তিনি রচনা করেন নি; তবুও যদি দমবন্ধ-করা নৈরাশ্য মনে হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই। তানভীর এই বিষয়টার কারণ অনুসন্ধান করেন ওয়ালীউল্লাহের রচনারীতির মধ্যে। এইখানে আমাদের আপত্তি। সাহিত্যের ইতিহাস আঙ্গিকেরই ইতিহাস, আর সাহিত্য তো আর সমাজবিজ্ঞান নয়, সাহিত্য শিল্প। একজন সাহিত্যিকের কাছে কেমন করে লিখব-টাই বড়ো, আঙ্গিক এবং বিষয়ের হরপার্বতীমিলনই সাহিত্য। অন্তত বিশ্বের বামপন্থী সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত উপন্যাস-গল্পগুলো থেকেও এই সত্যই উঠে আসে। দুনিয়া-বদলের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পের প্রকাশভঙ্গিকেও বদলাতে হবে,—শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে মার্কসীয় আলোচকদের এটাই তো নির্দেশ। ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যে বিষাদময়তার সঙ্গে-সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষা। চরিত্রগুলো যেন এই অবস্থাকে স্বীকার করতে চাইছে না। অমার্কসবাদী লেখক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহের কাছ থেকে এটাও কি কম পাওয়া? ফলে তাঁর সাহিত্যকে, জীবনবোধ আর দর্শনকে কিভাবে সিসিফাসের সঙ্গে তুলনা স্বীকার করব, যদি তানভীর নিজেই স্বীকার করেন 'শেষ পর্যন্তও যুক্তিবাদী থাকতে চাইছেন ওয়ালীউল্লাহ এবং জীবন সম্পর্কে আশাবাদীও'? তানভীর ছোটো-ছোটো পরিচ্ছেদ বিভাগ করে ওয়ালীউল্লাহের সমগ্র সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণকে আন্তর্জাতিক মানে ব্যাখ্যা করেছেন। তুলনামূলকভাবে সাহিত্যের আলোচনা খুব ভালো লক্ষণ, প্রয়োজনও। কিন্তু তিনি যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে মনে হয়েছে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যকেও পশ্চিমী সাহিত্যের নিক্তিতে যেচে নিচ্ছেন।

আমাদের অতি-আধুনিক কাব্যের মতো তিরিশের যুগের অনুসরণযোগ্য কাব্য-আন্দোলন তো কথাসাহিত্যে হয় নি। ফলে আধুনিক কবিতা যেভাবে বিদেশের কাব্য-ঐতিহ্য এবং লক্ষণকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে আধুনিক উপন্যাসের বেলায় তেমন দ্বিধা কেন, যদি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে সেখানে? আমরা শুধু দেখে নেব গৃহীত উপাদানগুলি দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস কিনা। এই মর্মে তানভীর একটি খুব সংগত প্রশ্ন তুলেছেন, জোটবদ্ধ মুসলমান পরিবারগুলোর মনোজগতে তখনো পর্যন্ত সামন্তভাবটাই প্রধান, বুরজোয়া অ্যালিয়েনেশনের সুযোগ কতখানিই বা ছিল যখন ওয়ালীউল্লাহ কলম ধরেছেন? বাংলাদেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা একটু খাপছাড়াই, অন্তত ওয়ালীউল্লাহের ক্ষেত্রে। তবে এমনটাও তো হতে পারে যে ওয়ালীউল্লাহ একটু এগিয়ে ভেবেছেন। আর বি-মানবিকতার প্রশ্নে তানভীরের সন্ধানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যদি একমত হই তাহলে বলতে হয়, ওয়ালীউল্লাহ তাঁর যুগের থেকে এককদম এগিয়েই। ওয়ালীউল্লাহ আগাগোড়াই মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধও। ফলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে একমাত্র রচনারীতির সাধারণ সীমাবদ্ধতায় পঙ্গু বলে চিহ্নিত করা প্রগতিবিরোধী। কেননা ওয়ালীউল্লাহ্-ও জনগোষ্ঠীর অবরুদ্ধ জীবনবিমুখতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন নানাভাবে। তাঁর সাহিত্যের মূল সুর পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষা। তিনি তো বাঙলা ভাষায় আঙ্গিক-সদিচ্ছাকে বদলে দেবার মতো কোনো পূর্বসূরি পান নি, ফলে উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এরেনবুর্গ, আরাগঁ, বারবুস হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

তানভীর ১৩৯ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন তুলেছেন তথাকথিত আধুনিক উপন্যাসের কাছে, তা হল, 'কোন একক ব্যক্তির অন্তরাত্মার কোন বিশেষ তাড়নাই কি শেষ পর্যন্ত হবে উপন্যাসের একমাত্র বিষয়?' প্রশ্নটি আমাদেরও। এর সদুত্তর তো খুঁজে নিতে হবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই। যে তাড়নায় গুনটার গ্রাস বেঁটে মানুষটিকে বলেন 'Grow Oscar, grow,' সেই তাড়নাই একদিন আমাদের উপন্যাসকে সম্মিলিত ব্যক্তির জয়গান গাইতে শেখাবে। সেই দিনে পৌঁছোনোর পূর্বে ওয়ালীউল্লাহের মানবতাবোধ এবং পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষার সাহিত্যসৃষ্টি কম কী?

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতার ইতিহাস ও কবিপ্রসঙ্গ, উপভোগ্য মূল্যায়ন

আধুনিক কবিতার ইতিহাস—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা-৬। পৃ-৩২৮। চল্লিশ টাকা।

প্রসঙ্গত কবিতা—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। মাঝি প্রকাশনী, কলকাতা-৬। পৃ ২১৮। কুড়ি টাকা।

কবিতা উপভোগ ও মূল্যায়ন—চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম। নবার্ক, কলকাতা-৫৯। পৃ ১৪৬। ত্রিশ টাকা।

"আধুনিক কবিতার ইতিহাস", নতুন সংস্করণে, 'যতদূর সাধ্য সমকালবর্তী হতে লক্ষ রাখা হয়েছে' বলে যে-দাবি করা হয়েছে তা কতদূর সুসম্পন্ন সন্দেহ; কিন্তু 'নানা অধ্যায়ের লেখকগণের মতবৈষম্য নিরাকরণে' নয়, 'বিভিন্ন দৃষ্টির সংযোগ ক'রে মূল ইতিহাসধারাটি দেখতে পাবার বাধা নেই' যে তা ঠিকই। "আধুনিকতার সংজ্ঞা" সন্ধানে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ব্যক্তিক চেতনার পরিণত প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে যুগচেতনা কিংবা যূথচেতনাই আধুনিকতা—এই ধারণা চূড়ান্তভাবে ভেঙে, কির্কেগার্ড, চেস্টরটন কি হেনরি জেমসের মতো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মানুষ 'নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে যে-অভিধায় বিবৃত করেছেন তা ধ'রে, সেই সঙ্গে ডে লুইসকে উদ্ধৃত ক'রে: Modern poetry is every poem whether written last year or five centuries ago, that has meaning for us still' মেনেছেন এবং শিলারভালেরি-ক্রোচেকেও টেনেছেন এই মর্মে যে, 'খেলাচ্ছলেই আমাদের কবিরা আজ আয়ুষাপনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ করেছেন'। অর্থাৎ নিঃসঙ্গতা, প্রাসঙ্গিকতা ও যে-ভাবেই হোক দায়িত্বগ্রহণ বা দায়বহন এই আধুনিকতার লক্ষণ। অতঃপর "রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা" প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রাক্কালীন মধুসূদনকেও 'আধুনিক' বলে সঠিক শনাক্ত করেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাবণের অন্তানিঃসঙ্গতম ভাষণে স্বয়ং কবিরই স্বগত শুনে: 'তবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে'; সঙ্গে য়ুরোপীয় রোমানটিকদের 'রূপালি ক্যাথার্সিস' বা 'হৃদয়মোচন' প্রসঙ্গোত্তর পটভূমিতে রবীন্দ্রব্যতিক্রমের প্রতিষ্ঠা দেন। রল্যাঁ, স্টপফোর্ড ব্রুক, ইয়েট্স্, পাউনডদের প্রাথমিক ও পরবর্তী রবীন্দ্রপ্রতিক্রিয়া, যুগবদলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এদেশীয় তরুণতর আধুনিকদের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিত্রাণসন্ধানেরযূথযাত্রাকথা অতিঅবশ্য আসে। "লিপিকা" থেকে বুদ্ধদেব বসু-ভাবিত রবীন্দ্রাধুনিকতার সম্ভবপরতা বিচার করে সঙ্গত কারণেই "গীতবিতানে"র কবিত্বে যে গূঢ়-গভীর পার্থক্যটি কোথায়, তার আর তল্লাস করেন না। কবির প্রাগস্তিমে যে 'প্রবল হয়েছিল প্রগতি-বিপ্লবের ডাক' তাও বলেন, তবে বিশদ করেন না; বরং অবশেষে বেশ একটু জট পাকিয়ে লেখেন: 'কবিকে টানতে লাগল তীব্র মাটি, প্রাকৃত আত্মীয়পরম্পরা, নিজের পুরোনো প্রত্নের দুচ্ছেদ্য গ্রন্থীর টান, নতুন গর্ভধারণের লোভী সেই মৃত্তিকা-জননীর জরায়ু—দূর ঐশী নীলিমার চেয়ে আরো গূঢ়নিবিড় সেই টান'—এই হল তাঁর মতে 'প্রথম উত্তররবীন্দ্র আধুনিকতা'!

"প্রধানত তিরিশের কবি ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী যথেষ্ট ইতিহাস-সচেতনায় অবলোকন করেন: 'তিরিশের কবিদের পরিণত কাব্যেও অবচেতনে-সুপ্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি হঠাৎ আলোয় উঠে আসে কোনো এক চকিত মুহূর্তে'; ছন্দের পরীক্ষায়ও। বিশেষত তিনি বুদ্ধদেব-অমিয়র পাশ্চাত্য প্রেরণা-প্রণোদনা সত্ত্বেও তাঁদের গভীরশায়ী রাবীন্দ্রিকতা নিরীক্ষা করেন এবং জীবনানন্দের 'আছে' পুনরুক্তিতে রৈবিক আস্তিক্যের উপস্থিতি, তাঁর "সুরঞ্জনা" "মিতভাষণ", "সুচেতনা" ত্রয়ী কবিতায় মালিনী-রক্তকরবীর প্রভাবও অনুভব করেন। এমনকি তাঁর 'সাধু সর্বনামের আকস্মিকতায়' এবং 'মহিলা'-শব্দের বিশিষ্ট আবিষ্কারে পর্যন্ত! 'সর্বব্যাপী সৌর প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি বিষ্ণু দে-ও, তাঁর মার্কসীয় তত্ত্বে অনুপ্রেরিত কবিতায়ও না'। "পাঁচ প্রহর" কবিতায় বিপ্লবী বীরের যে-আগমনস্বপ্ন তিনি দেখেন, তার মধ্যেও "চণ্ডালিকা" ও "খেয়া"র একটি প্রসিদ্ধ কবিতার স্মৃতি-অনুরণন যে অনুমেয়, লেখক তা স্পষ্টত বলেন। তিরিশ-দ্বিতীয়ার্ধ ও চল্লিশের বিপুল 'বামাবর্তে' মার্কসীয় জীবন-দর্শন ও মায়াকভস্কি-এলুয়ার-আরাগঁদের প্রবোচনা ছাড়া রাবীন্দ্রিক 'ব্রাত্য'-চেতনা তথা উদার-মানবিক মানসিকতা যে প্রেরণায় সমমূল্য, তাও তিনি

দেখান। পঞ্চাশ পর্যন্ত এই প্রবণতাকে স্থিরলক্ষ্য করেন লেখক।

"তিরিশের কবিতা"য় বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রেমেন্দ্র মিত্রদের। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এইভাবে শুরু করেন: 'আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাই উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল'। এবং তিনি 'নিছক উদ্বেগের কবি নন', বিশ্বাসেরও কবি। বুদ্ধদেবের কবিতা-নেতৃত্ব সত্ত্বেও তাঁর কবি-নেতৃত্বে 'ধারাবাহিক ভাবে কোনো উত্তরপর্ব নেই'; 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায়, তত তাকে শিল্প-প্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব'—এই কথাদ্বয়ীর কাজেও সফল জীবনানন্দ; 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' বা তার ভঙ্গুরতায় সুধীন্দ্রনাথ; 'অনেকসময় প্রাঞ্জল নয়' বিষ্ণু দের 'ভাষাবিন্যাস ও প্রয়োগনৈপুণ্য' তাঁর "সাতভাইচম্পা"র সমাজজীবনজিজ্ঞাসা পরিণত "স্থিতিস্তা ভবিষ্যতে"ও উন্মুখ; 'আঙ্গিকের দিক থেকে···বরাবরই স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী' অমিয় চক্রবর্তী। পর্যালোচনাটির মুখ্যাংশ অধিকার করেছেন, সঙ্গত কারণেই এঁরা। অজিত দত্ত আলোচনায় আসেন; হেমচন্দ্র বাগচী, মণীশ ঘটকও লক্ষণীয় হন; কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য যথেষ্ট অভিনিবেশ পান না, যেহেতু তাঁর পরিণত চল্লিশ-পঞ্চাশে?! আর সমর সেন, অরুণ মিত্র?! পক্ষান্তরে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত চল্লিশের কবিদের সেই 'সমকালীন বাংলা কবিতা'-সংকলন থেকে টেনে নেন; এক দিক দিয়ে ইতিহাসসম্মত। সমর সেন-এর কথা মনে আছে বলে, অরুণ মিত্রকে দু-তিন ছত্রে উল্লেখ করেন। প্রধানত লেখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা। "আমার কাজ" কবিতায় সুভাষের 'সমগ্র জীবনদর্শন প্রতিফলিত' দেখেন: 'জনগণকল্যাণের কথা লিখলেও,' তাঁর কবিতা 'আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করে না'। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেন তার। এবং নীরেন্দ্রনাথের এক ধরনের 'জোর' ও ব্যঞ্জনার জন্য যে-'পুনরুক্তি', তার প্রভাব পরবর্তীদের মধ্যে টের পান। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভগ্নাংশে আলোচিত। অরুণকুমার সরকার-নবেশ গুহ প্রভৃতি অনেকেই অল্পস্বল্পে; একক্রম নিয়মরক্ষার মতো 'ক্যাজুয়াল' এই রচনায় এরকম সুচিন্তিত মন্তব্যও আছে অবশ্য: 'হালের কবিতার আত্মীয়কতা এক দুঃসাধ্য পরিশ্রমী প্রচেষ্টা'।

পঞ্চাশের কবিরা সেদিক থেকে তুলনায় যথেষ্ট সমাদর এবং বিশ্লেষণ পেয়েছেন; সমধিক যোগ্যতার জন্য? নাকি স্বয়ং প্রাবন্ধিকের সঙ্গে ঐ-দশকীয় কিছু কবির আন্তরিক যোগ আত্যন্তিক বলে? যাই হোক, মূল প্রসঙ্গটি যথাসাধ্য উপস্থাপনে দেবীপ্রসাদ লেখেন: 'হাওয়া-যন্ত্রের মতো নথি ক'রে রাখতে বসল দিনকালের কায়মনোবাক্যের প্রত্যেকটি দবল'—পঞ্চাশের কবিরা। বিপরীতভাবে মণীন্দ্র গুপ্ত লেখেন: 'পঞ্চাশের স্মার্ট সাংবাদিক তরলতায় বিরক্ত' নাকি যাটের 'দুরূহতাকামী কবিরা'।—'অথচ নতুন কোনো গভীর সৃষ্টির ধ্যানসামর্থ্য না থাকায় শুধুই প্রতিক্রিয়াবশত তাঁরা পিছিয়ে গেলেন তিন ধাপ—সমকালীন উপস্থিতিকে অস্বীকার করে পছন্দ করলেন তিরিশের ধ্রুপদীয়ানাকে।' কতকটা সত্য। কিন্তু সত্যই কতটা? আদতে একটি 'সামান্য' সাংঘাতিক-অসম্পূর্ণতায় এই গ্রন্থের ইতিহাস-অংশের, বিশেষত দশকওয়ারি আলোচনার শেষ কটি প্রবন্ধই আক্রান্ত তা হল: গোড়ায় যেভাবে লেখা হয়েছিল, সেই যাটের দশকে, তারপর আশির দশকে এসে তার আর প্রয়োজনীয় কোনো পরিমার্জনা আর সংযোজন ঘটে নি। অথচ অনেক আলোচিত কবিরই পরিবর্তন-পরিণতি ঘটেছে। তাই 'আপটুডেট' না-হওয়ার যা বিড়ম্বনা আর ক্ষতি, তা এসব আলোচনায় বর্তেছে।

বরং "ভাষার মুদ্রা—আধুনিক কাব্য", "কাব্যনাট্য ও তার ভাষা", "প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাব্য-পাঠক" (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নেই?) "শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ", "সাহিত্যপরিভাষা"—এই মূল্যবান প্রবন্ধকটি অনুষঙ্গ,-অংশেই মুখ্যত, বইটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। সবিশেষ উল্লেখ্য প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধদ্বয়—লেখক: যথাক্রমে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশ্রুকুমার সিকদার। 'আধুনিক কবিতা'—'তার ডাক-নাম' দিয়ে সরোজবাবু তাঁর রচনাটি চমৎকার শুরু করেন, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'অস্পষ্টতা' ও উত্তরকালীনদের তথাকথিত 'দুর্বোধ্যতা' বুঝতে চান; আর কবিতার প্রাণ যে-শব্দচেতনা এবং তার প্রাণ যে-'আমিত্ব', তা থেকেই কবিদের স্বতন্ত্র 'মুদ্রা' সন্ধান করে বলেন: রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাঙালি কবির 'আমি' নায়ক নয়, পূর্বযুগের অর্থে নয়; কেননা আজ সে 'বিশ্লেষক' মাত্র; 'আত্মব্যবচ্ছেদের ওপর আলো ফেলার জন্যই ডাক' পেয়েছেন তাঁরা, তাই তাঁদের কেউই প্রায় 'গান লেখেন নি,' যেহেতু 'ব্যবচ্ছেত্তার গান নেই।' এটি একটি বিশিষ্ট ভাবনা নিঃসন্দেহ। অতঃপর রূপকের প্রসার থেকে প্রতীকের সংহতি বিচারপূর্বক কবিতায় বিশেষ-বিশেষ শব্দব্যবহারের গুরুত্ব, কবিতার গঠনবিন্যাসে formal logic পরিবর্জনে তীব্রতাসঞ্চার কিভাবে 'আধুনিকতার সুমুদ্রিত স্বাক্ষর' হয়ে ওঠে, 'শব্দের এই বহুবর্ণবিস্তারী শক্তি' যে 'সার্বিক অস্তিত্বের গ্রন্থিল জটিলতা' তথা কবিদের 'প্রতীকী যুক্তি', তা 'দুর্শোচনীয়' হলেও লেখক তা খুলতে চান। বস্তুত কবিরা যা বাঁধেন, সব সমালোচকেরা তা খুলে দেখান। সে-হিসেবে সরোজবাবু সার্থক। আর অশ্রুবাবু তাঁর কাব্যনাট্য ও ভাষাপ্রসঙ্গে বলে নেন: Poetry in the theatre'ই কাব্যনাট্য এবং সেটিই বিবেচ্য। ইবসেন একসময় তাঁর এক চিঠিতে ঘোষণা করেছিলেন, 'Verse has been most injurious to dramatic art'—পালটা অশ্রুবাবু বলেন: 'কিন্তু যুক্তিবাদের প্রতাপে নাটকের মাধ্যম একমাত্র গদ্যই হয়ে ওঠায় নাটকের মান নেমে এল, নাটক যেন আর আগের মতো উচ্চাশী রইল না।' তিনি ঠিকই আশা করেন, কাব্যনাট্যের ভাষা 'হীন স্বপ্ন' ও 'সমুদ্রত স্বপ্নের আপাত-দ্বিধাবিভক্ত জগতের মধ্যে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করবে।' রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নৃত্যনাট্য বা ইয়েট্স্-এর 'plays for dancers' আসলে 'স্বভাবসত্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' তা জানিয়ে, লেখক আধুনিক কাব্যনাট্যের পক্ষে মুক্তছন্দই যে সবচেয়ে উপযোগী তা দেখান এভাবে: 'এই ছন্দের স্পন্দন অনুভব করা যায় নৃত্যনাট্যগুলো পড়ার সময়, তাদের সুরহীনতার' (নৃত্যহীনতারও বটে) 'অপরিহার্য শ্রীহীন বৈধব্য সত্ত্বেও'।—'যে-ছন্দে স্বাধীনতা ও নিয়মের সম্মিলন—স্বাধীনতা দিয়ে সে ধরে সাময়িককে, নিয়ম দিয়ে সে ধরে সত্যের সুষমাকে।' অর্থাৎ শাশ্বতকে। 'কালসন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যনাট্যে বুদ্ধদেব বসুরও প্রধান বাহন যে এই ছন্দ, তা দেখিয়ে লেখক প্রসঙ্গত 'stylization'-এর মীমাংসা করেন এবং 'speech as action' সম্পর্কে বলেন: 'এই quoting poetry o speaking poetry-র মধ্যে যে-প্রভেদ, গীতিকবিতা-কাব্যনাট্যের ভাষার মধ্যেও সেই প্রভেদ'। Cocktail partyর সিলিয়াকে যথাযথ 'উদ্ধৃতিতে' তাঁর প্রকৃত কাব্যনাট্যের ভাষা-নির্দশন প্রতিষ্ঠা পায়। 'মঞ্চে অভিনয় ও প্রযোজনাগত সাফল্য'-কথাও তিনি ভাবেন ও প্রবন্ধশেষে পৌছন এই বলে: 'বীরাঙ্গনা' পড়লে মনে হয়, 'তিনিই (মধুসূদন) হতে পারতেন প্রথম কাব্যনাট্যকার'।—গভীর ঐতিহাসিক সত্য নিশ্চয়ই। এবং সবশেষে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সাফল্য-পরবর্তী 'কালসন্ধ্যা'ও যে বিশেষত 'ভাষানির্ভর' তা বলেন, স্বয়ং বুদ্ধদেবেরই কথায়: 'একমাত্র অঙ্কুরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার'। কিন্তু কতখানি 'উজ্জ্বল উদ্ধার'? প্রাবন্ধিক তা স্পষ্ট করেন না।

২

'প্রসঙ্গত কবিতা' গ্রন্থের সর্বপ্রথম আলোচনা কবিতার শরীরে রহস্যময়তার ভূমিকা নিয়ে। কবিতাকে সব সময় না হলেও, অনেক সময় অন্তত বেশি বোধগম্য হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত এবং কিছু নিভৃত গূঢ় গোপনতা কবিতার একান্ত সম্পত্তি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক মন্তব্য-সমর্থনে লেখক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় হাউসম্যানকে পেশ করেন: 'Perfect understanding will something extinguish pleasure,' যেহেতু কবিতা হল 'saying one thing and meaning another, saying one thing in terms of another' এবং সুবিশ্লেষণসহ কবিতা বুঝতে যে দৃষ্টির ('inner eye') বিস্তৃতি ও গভীরতা জরুরি তা বলেন, ঠিকই বলেন। শব্দানুষঙ্গই কবিতার প্রাণ ও প্রেরণা প্রসঙ্গে লেখক অনেক বাক্‌প্রতিমা বিচার করেন; কবিতামধ্যস্থ 'অনুক্তি, অনুল্লেখ, সংকোচন-প্রসারণের হেরফের, গোপনীয়তা, লুকোচুরি' ইত্যাদিতে 'উৎকণ্ঠা' ও 'রহস্য-শিহরণ' টের পান এবং এক-একটি কবিতার চূর্ণ চিন্তায় এই সমীচীন সিদ্ধান্ত করেন: 'জীবনযাপনেই প্রেম-অপ্রেম; কোনো কোনো কবিতা এই জীবনযাপনই—আখ্যানে, প্রত্যাখ্যানে, প্রতীকায়'। আর অপ্রেম-অনীহা যখন 'মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ছবি' আনে, তখন যে লেখক বলেন: 'এক বিশেষ দশকের এই প্রবণতার মধ্যেও উঁকি মেরে যায় এক অস্বস্তিকর স্ববিরোধ, এক সরকরণ সর্বনাশ—সমসময়ের, সবসময়ের।' কিন্তু কথা ওঠে: সমসময় ও সবসময় এখানে একত্র উচ্চার্য কেন? কেননা 'অবক্ষয়' তো চিরচিহ্ন নয়, ক্ষণলক্ষণ। 'কীভাবে কবিতা বদলে যায়'—অভিনব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। 'বলনভঙ্গি' পালটায় কেন? কারণ 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে'। নামকরণের সূত্রেও কত বদলে গেছে কবিতা, যাচ্ছে তারও সদৃষ্টান্ত সুবিচার এখানে পাই। অতিনাস্প্রাতিক কবিতার দুর্বোধ্যতা-দুরূহতা ব্যাখ্যায় লেখক: 'অতিবাস্তবতার রক্তাধিক্য,' 'স্বকীয়তা-

রক্ষার উৎসাহে ভাঁটা' ছাড়া 'পরিমাপ রক্ষা করে কথা-বলার রেওয়াজ প্রায় উঠে যাচ্ছে,' বলছেন। সেইসঙ্গে কবিতার 'inner logic' রক্ষার দায়িত্বে অচেতন উপেক্ষা ও অবহেলা, একান্ত অতিব্যক্তিগতেরই সর্বস্বতা এবং বাঞ্ছনীয়তম 'depersonalization'-শর্তের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদিও কি বিবেচ্য নয়? কবিতাকে 'সত্যবদ্ধ অভিমান' হিসেবে দেখতে-দেখাতে লেখক শুরু করছেন: 'অভিমান। এতখানি ঐশ্বর্যময় স্পর্শাতুর সংজ্ঞাতীত শব্দ আর কী আছে?' ঠিকই। আর সেই 'অভিমান' খাঁটি সত্যসন্ধ হলে যে জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' ফলে ওঠে, প্রাবন্ধিক তা চমৎকার দেখিয়ে দেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এই অভিমান 'অহঙ্কারে' আর্ত ও মত্ত হয়ে উঠলে যে-নৈরাজ্য ও নিষ্ফল স্বেচ্ছাচার দেখা দেয়, তার কণ্টক কি ষাটের দশকোত্তর আজ পর্যন্ত সংকট নয়? এরপর লেখক কবিতা ও চলচ্চিত্রের ভাষাগত পরস্পর পরিপূরকতা, প্রেরণা-প্রভাবের আদান-প্রদান প্রসঙ্গ দুটি সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধে সদৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত করেন। খুবই বিচক্ষণ বিচার।

অবশ্য এ-গ্রন্থের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য-বিশ্লেষণ 'কবি-ব্যক্তিত্ব' প্রসঙ্গ-কটি। প্রথমেই জীবনানন্দ। 'এখন হেমন্ত ঢের'—হেমন্তের ব্যঞ্জনা যেহেতু জীবনানন্দে অন্তর্লীন তাই অন্তহীন, লেখক তার ও তাঁর যুগপৎ 'infinite variety' বোঝান এভাবে 'একই সঙ্গে সে নৈরাজ্য ও নীলিমার অবলম্বন, বেদনা ও বৈভবের প্রতীক, শূন্যতা ও শান্তির আশ্রয়, বিচ্ছেদ ও বিস্ময়ের মিশ্রণ। এবং তারই উপযুক্ত প্রবক্তা-রূপী তিনি তাই যেইমাত্র বলেন: 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মুহূর্তে উন্মোচিত হয় হেমন্তের যুগপৎ পূর্ণতা ও শূন্যতা, স্বয়ং কবিরও। গভীর প্রযত্নশীল স্বোপলব্ধিযোগে এই নিবিড় নিরীক্ষাটি লেখক উপস্থিত করেছেন। অতঃপর সুধীন্দ্রনাথের সনেট প্রসঙ্গে 'আমার আনন্দ বাকো'—স্বদীন্দ্রীয় উক্তিকেই শিরোভূষণ করায় প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, যথাযথ। সুধীন্দ্রনাথ অতীব শব্দসচেতন ছিলেন, তারই কি ফল তাঁর অত্যন্ত অনুপ্রাস-অনুরক্তি? অব্যয়বাহুল্য? এসবের চমৎকার বিচার পাই এখানে। 'তাঁর কাব্যিক প্রবণতা শব্দসৃষ্টির উদ্যানদার পথে নির্দেশিত হয়েছে'—খুবই বিচক্ষণ মন্তব্য। তৃতীয় প্রসঙ্গ হল বুদ্ধদেব বসুর 'একদিন: চিরদিন'-চরিত্রসন্ধান। 'জনসভার মতো প্রকাশ্য' হয়েও 'গুহার মতো গোপনচারী যে-বুদ্ধদেব, তাঁরই পরিক্রমা করেছেন লেখক, যথোচিত অনুকম্পায়। গদ্যকবিতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি অরুণ মিত্রকে লেখক এভাবে-ভাষায় লক্ষ করেন: গদ্যের ক্রমিক ধারাবাহিকতায় কবিতার নির্মাণে যোগ হচ্ছে নতুনতর মাত্রা, কখনো আবার যতিনির্দেশ-চিহ্ন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে উদ্ঘাটন করা হচ্ছে নির্ধারিত সম্ভাবনা, গদ্যের বাগ্-বিন্যাসের নতুনত্ব থেকে এমন কি নতুনত্ব নির্ণীত হয়েছে বিষয়েরও এবং গদ্যের ব্যাকরণিক বদলে কখনো বাক্যের অসমাপ্তি অথবা ক্রিয়াপদের অনুপস্থিতি গদ্যের জলহাওয়ায় গভীর গূঢ় পরিবর্তন এনেছে। এহেন ধীরস্থির কৃতসঙ্কল্প সৎ কবিরই এই সঙ্গত ভাষণ: 'এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ' এবং 'ভালোবাসার জন্যে আমার বুকের দুই বাতায় অভ্যর্থনা টাঙিয়ে রেখেছি।' 'সবচেয়ে শহরমুখী, নগর-অবলম্বী' হয়েও কেন কিভাবে এই কবি অনেকটাই গ্রামানুষঙ্গী তারও উচিত ব্যাখ্যা দেন প্রাবন্ধিক এবং কেন তাঁর মতো কবির এই সাংঘাতিক উচ্চারণ: 'আমি এক মরা আকাশ নিয়ে শহরের রাস্তায়।' অনেকটা চল ক্রিয়ী ঋত্বিক ঘটকের মতো কি মনে হয় না তখন, কবিকে? অথচ সুগভীর জীবনদার্শনিক মুহূর্তে-মূর্তিতেও কবির ভাষা 'কত নিরহঙ্কারী, আটপৌরে, শাদামাটা'—ঠিকই। পাশাপাশি 'নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে থাকার তাগিদ থেকে', 'সময়-সময় বেদনাজর্জর দুঃসহ এক বিবোধ থেকেও' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমাজমনস্কতা গঠিত বলে লেখক লক্ষ করেন। 'সকরুণ মধ্যবিত্তের জীর্ণ অস্তিত্বের চেহারাটা' অনেকবারই তাঁর অমলকান্তি-সিতাংশু-মৃন্ময় প্রমুখে পাওয়া গিয়েছে। এসব নির্মাণ-নিদর্শনীশেষে লেখক বলেন: 'আনন্দের সমর্থন, শোকের সান্ত্বনা'-দায়ী কবি নীরেন্দ্রনাথ ক্রমেই ক্ষোভ-ক্রোধ-আক্রোশ-বক্রোক্তিতে ভরে ওঠেন, 'সমাজটার এখানে খানা, ওখানে খন্দ' দেখে-দেখে এবং সেসব আর আদৌ বুজবে কিনা এই আতঙ্কিত সন্দেহে। 'বিদ্যুতের ভাঁড়ে মা ভবানী' ও 'কালোবাজারের ঠিক দেড়টাকা পিছনে' শাদাবাজারের এসে-দাঁড়ানো নীরেন্দ্রনাথের মানবচক্ষে যে-গ্লানি ও উষ্মা সঞ্চার করে, তারপর কবির সমাজমনস্কতা বিষয়ে আর প্রশ্ন কী? তবে তিনি 'নির্দল' হয়েও যে 'মানুষের মিলিত উদ্যম' ও 'একইসঙ্গে এমন বিষাক্ত-মনোরম উল্লাসের আবির্ভাব' বেশ উপলব্ধি করেন, তা লেখক জানিয়ে দেন।

এরপর দুটি প্রবন্ধে পরবর্তী প্রতিনিধিস্থানীয় দুই প্রধান সুনীলকুমার নন্দী ও শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে তিনি যথাক্রমে 'অন্তর্গত নীল অনুভব' ও 'আমার শব্দহীন স্তব' বলে অভিহিত করেন। 'স্বাতন্ত্র্য-হারানো মঞ্চ সাজাবার অধুনা রেওয়াজে' বিমুখ ও সামাজিক বিষয়ে অনুচ্চকণ্ঠ-প্রতিবাদী সুনীলকুমার যে অন্তর্লীন অনুভব ও গভীর স্বোপলব্ধিরই কবি, তার আদ্যন্ত নিরীক্ষা করেন লেখক। সঙ্গে দেখান তাঁর গ্রন্থ থেকে গ্রন্থে কবিতা রচনার প্রাকরণিক পরিণতি ক্রমোত্তরণ। উল্লেখ করেন কবির এক প্রাসঙ্গিক সাক্ষাৎকার: কবিতার শরীরে অনুভবের চাপ কখনো মিশিয়ে, কখনো-বা অন্তরালে ঠেলে দিয়ে কবিতার মাত্রা ···গভীরতর সংকেত বাড়িয়ে তুলতেই চান তিনি, যাতে 'কবিতার টেনশন নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'তে অধিক তীব্র অথচ অকৃত্রিম হয়ে আসে, উচ্চারণ গাঢ় হয়'। তাই আমাদের ভাবগত উচ্চারণের সঙ্গে বাচনিক শ্বাসক্ষেপ মেলাতে গিয়ে কবিতার দীর্ঘ পংক্তি অনেক সময়ে আরো ঝুলিয়ে বা সেই পংক্তি ভেঙেচুরে, তার বিন্যাসে ধ্বনির স্পন্দন এমন স্বভাবজ ভঙ্গিমায় তুলে আনেন কবি, যাতে 'পাঠকের কানে শব্দের বা ছন্দের কোনো অতিরিক্ত ধাক্কা না লাগে—অথচ কবিতা গতিময় হয়ে ওঠে'। সমকালীন রাজনীতি-সমাজসচেতনতা তাঁকে 'উগ্রউত্তেজনায় উচ্চবাক্ করে তোলে না,' অথচ রিয়্যালিটি-অবজেক্টিভ নির্ভর বহু বহির্বিষয় (যেমন দেশের সর্বনাশা বন্যা) কবির 'হৃনার রিয়্যালিটিতে' স্তরে-স্তরে গভীরাশ্রয় পেয়ে ক্রমেই দৃঢ় ঋজু উচ্চারণ হয়ে ওঠে, তখন কবির 'অনুচ্চ স্বরেও তীব্রতা ঠিকরে বেরিয়ে আসে' —উচ্চসমাসীন হর্তাকর্তাদের প্রতি পুঞ্জীভূত অকর্ম-অনীতি-অন্যায়জনিত সমালোচনা ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়, 'শব্দের অধিক শব্দ যে শব্দের দ্যোতনা য়। 'বিষ' নামের বিশেষ একটি কবিতাকে লেখক তাঁর সমর্থনে সম্পূর্ণ উদ্ধার ক'রে দেখান। এখানে সেই সংহত-সুঠাম কবিতাটির আরম্ভ ও শেষটুকু লক্ষণীয়: 'জলের কোথায় দোষ, কোথায় জলের স্বেচ্ছাচার' এবং 'জল / ইতিমধ্যে বিষ / কোথায় রয়েছে দোষ, কার অবহেলা গূঢ়, কার স্বেচ্ছাচার!'—জলের? না আমাদের মনোনীত মাননীয়দের? বক্তব্য চেয়ে অব্যক্তকেই যে কবি ইঙ্গিতে-ইসারায় অনুরণিত করে তুমুল তুলে ধরেন তারও বহু উপযুক্ত উদাহরণ বিশ্লেষণ করেন প্রাবন্ধিক। পাশাপাশি শঙ্খ ঘোষকে তিনি এভাবে দেখেন: যেখানে তাঁর বিষয় ব্যক্তিসত্তার মৌল দ্বন্দ্বে বিকীর্ণ, ব্যক্তিক জীবনবোধের গণ্ডী পেরিয়ে ঊর্ধ্বগামী, ঈশ্বরবোধ ও ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত, সেখানে তাঁর প্রকাশপদ্ধতির ঘনবিন্যাস স্তোত্রের মতো, স্তবের মতো নিবিড়।—'ধর্মীয় চেতনা' ? খটকা লাগে। তবে 'সংবৃত, সংযত, সাবধানী' ব'লে কবির লক্ষণ-নির্দেশটি অবশ্য মান্য। এই কবি সম্পর্কে লেখকের আরও বক্তব্য: 'চেতনায় রোমান্টিক, তবু উচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে অনাস্থা, নির্জনতাপ্রেমী' অথচ 'সেই নির্জনতায় জনতার পা পড়ে।' এবং 'পথচলতি বাক্‌প্রবাহ' 'দৈনন্দিন কথ্যস্পন্দ'ও যে প্রাত্যহিকতার সীমাস্তর ছাপিয়ে যায়, তাঁর কবিতায় যৎসামান্য কথ্যভঙ্গিমার সঙ্গে কী নিবিড় সম্বন্ধে সম্পৃক্ত হয়েছে কাব্যিক বাক্‌স্পন্দ, আর তাঁর কবিতার স্তরে-স্তরে, কাব্য থেকে কাব্যে, শ্রুতি-সুভগ ছন্দের হাত ধরে স্বতঃস্রোতে চলেছে মিল, 'মিলের মিছিল', তাও যথেষ্ট করে দেখান লেখক। 'অল্পশরীরী কোনো উচ্চারণ'কে স্মরণীয়তা দেওয়ার মৌলিক দক্ষতায় পঞ্চাশের এই দুজন সফল ব্যক্তি-সমাজের কবি যে উত্তরোত্তর পরিণত ও সার্থকতম প্রতিনিধি, তা তাঁদের বিশিষ্ট রূপায়ণক্ষমতার নিদর্শনমালায় লেখক নিশ্চিত প্রমাণে প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে প্রাবন্ধিক: 'আটপৌরে বাগ্-বিধির সঙ্গে জোট দিয়ে হাল্কা চালের কথ্যভঙ্গির সুকুমার প্রয়োগ জীবনানন্দের পরে···আবার এল' এবং 'লৌকিক ছন্দের ঠমক-গমক মিল-অমিলের রোমাঞ্চকর সহাবস্থানের মধ্যে সাসপেন্সের যে-মোহ আছে, তার দিকে আকৃষ্ট হওয়া মানেই' তাঁর কবিতা। "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো" এবং "সোনার মাছি খুন করেছি", যে-কাব্যদ্বয় তাঁকে বিখ্যাতির তুঙ্গে তুলেছিল, তারপর থেকে জলবায়ু বদলে গেছে কবিচেতনায়?'—'না' বলে রায় দেন লেখক এবং যোগ করেন: সেই ছন্দমনস্কতা, অব্যর্থ বক্তব্যের স্বরক্ষেপ, শৈল্পিক সামর্থ্য, দুর্মর আবেগ, মেঠো মেজাজ সবই আছে এবং 'বিষয়ের কেন্দ্রে শহর থাকলেও গ্রামীণ মেজাজের···বিশেষ চংটি যেন একমাত্র শক্তিরই একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা'। তাঁর হাতে কিছু কিছু 'শব্দজোট' ও শব্দ-শব্দবন্ধের নতুন ডাইমেন্‌শান্ কিভাবে খুলে যায় তাও দেখান লেখক, বলেন: 'বাক্-প্রতিমার অনুভব অনুষঙ্গে জীবনা-

নন্দের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শক্তির অনেক কবিতা; তাঁর একদিকে বিশ্বাস ও আস্তিক্য, অন্যদিকে সমস্ত অস্তিত্ব ঘিরে একটা অকুন্ঠদ্ধ 'আর্তনাদ', ফলত তাঁর ইমেজ, বাক্‌বন্ধ, গাঠনিক প্যাটার্ন, আঙ্গিক-এ 'বিপর্যয়-উচ্ছ্রঙ্খলতা-যথেচ্ছাচার'; 'একই শব্দ একই বাক্য পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তি নেই', ঘোষণায় হয়তো বাহুল্যই ঘটে অনেকবার, তবু সব উন্মাদনার একটা সমগ্র ইম্‌প্রেশন ফুটে ওঠে, যেমন তার 'শ্রেষ্ঠ' নিদর্শন, লেখক মনে করেন, 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময়'। পক্ষান্তরে এক 'অভিমানে অবরুদ্ধ' 'উত্তেজনায় অস্থির' চরিত্রের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখক এখন এভাবে লক্ষ করেন : মানুষের ক্ষোভময় বেঁচে-থাকার সেই যেসব উদ্ভত ইচ্ছের অধ্যায়গুলো, যা একদিন তাঁকে নিঃসঙ্কোচ উগ্র করে তুলত, সেইসব স্পর্ধিত উচ্চারণে আজও সাড়া দেন তিনি, ক্ষুব্ধ হতে হয় আগের মতোই, দুর্লভ এক লগ্নকেও আলিঙ্গন করতে চান একই সঙ্গে—'ইচ্ছে হয় কিছু একটা তৈরি ক'রে গেলে মন্দ হয় না।' ফলে এতদিনে তাঁর 'গুমরে-ওঠা বিষণ্ণতার গভীরে আরো গাঢ়তার সঞ্চার করেছে এক প্রতীক্ষা।' এভাবেই এই আদৌ অগতানুগতিক ও স্বাধীনচেতা কাব্যসমালোচক, যিনি একই সঙ্গে মর্মাগ্রাহী, শৈলীসন্ধানী ও বিশ্লেষণজ্ঞ, আধুনিক কবিতা ও কবিপ্রসঙ্গের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন।

৩

কবিতাপাঠক মানেই কি কবিতার উপভোক্তা? না। কবিতার উপভোগ-ক্ষমতা ও মূল্যায়নদক্ষতা কি প্রভূত শিক্ষাসাপেক্ষ? অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে? নিশ্চয়ই। তাই কবিতাবিষয়ক আমাদের সচরাচর অশিক্ষা-অপশিক্ষার নিরাকরণই চান "এই কবিতা উপভোগ ও মূল্যায়নে"র লেখক চঞ্চলকুমার ব্রহ্ম; তাঁর গ্রন্থের 'উপক্রণিকা'-অংশে তিনি এজন্য শিক্ষিত কবিতাপাঠকের লক্ষণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেন। সে-বাবদ বিশিষ্ট পাঠানুশীলন শেষ ক'রে কবিতার আবেদন সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেদনের বিশ্লেষণও কাব্য-বিচারের প্রথম যোগ্যতা বলে তিনি ধার্য করেন, অনুভূতি-সংবেদনকে শাণিত ও বৃহত্তর আর্থে মনীষাকেও উজ্জ্বলতর করার কঠিন দায়িত্ব স্বীকার করে নেন। কেননা তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিকতা থেকে সংবেদনের বিচ্যুতি এক ভয়ানক ত্রুটি। একটি সুবিদিত রবীন্দ্রকবিতাবিতর্কেরও তিনি পুনরুল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করে দেখান যে, তখন আবু সয়ীদ আইয়ুব তো বটেই, শব্দ ঘোষও পূর্বোক্ত বিচ্যুতিতে জড়িয়েছিলেন (পৃ ১৯)। এখানে মাত্র মতান্তর নয়, স্বকীয় যুক্তির প্রতিষ্ঠাই তিনি করতে পেরেছেন। এরপর ভালো কবিতাকে খারাপের থেকে আলাদা করাটাই যে আদত দায়, তা বুঝিয়ে লেখক বলেন : কবিতার জটিল পূর্ণাঙ্গতাই আদৌ অভিনিবেশযোগ্য। কেননা তাঁর মতে : 'মহৎ কবিতা আমাদের দেয় অভিজ্ঞতা,' আর 'অসৎ কবিতা দিতে চায় বাণী' এবং 'প্রগাঢ় অনুভূতির পরিবর্তে অনুভূতির ভান দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা' 'অসৎ ও অক্ষম কবিত্বের আর একটা লক্ষণ।'

সুতরাং লেখকের বক্তব্য : ভাব ও ভাষার সৌম্য মিলনে যে ঐকতান গড়ে ওঠে মহৎ কবিতার অনুভবে, তা বোঝার মতো শিক্ষিত ও শাণিত সংবেদনেই 'অনুভূতির শিক্ষা সার্থক'। লেখক এই অনুভূতির শিক্ষাই কবিতা-পাঠককে দিতে চান, আর তাই অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা অর্জনে কবিতা-আবেদনের বিভিন্ন দিকগুলিকে (যথা মনন ও মনীষা, অনুভূতি, চিত্রকল্প, ভাষা, ধ্বনি, মিল, ছন্দোস্পন্দ, রূপবন্ধ) অত্যন্ত 'নিবিড় বিশ্লেষণের বিষয়' করে তোলেন।

কবিতার এই 'আবেদন' তথা 'উপাদান'-বিচারই গ্রন্থের উপজীব্য। এজন্য প্রথমেই মনীষা ও মনন-প্রসঙ্গে লেখক বলেন : পূর্ণ বাস্তবকে অঙ্গীকার করারই এক নাম মনন, তাকে ছাড়া আবেগে নিমজ্জন যেমন অবাস্তব ভাব-বিলাস, অনুভূতিকে নির্বাসিত করে তন্মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাও তেমনি বাস্তব জীবনের অংশমাত্রকে স্বীকার ও কবির অখণ্ডসত্তা অর্জনে অনীহা। এই মননের ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা দিয়েই বোঝা যায় : 'সফল কবিতা শুধু আবেগের চাপ থেকে নয়, ভাবনার উৎকেন্দ্রিকতা থেকেও উত্তরণ।' দৃষ্টান্তসহ বিচারে তিনি শুধু আবেগের অপরিচ্ছন্নতা ও ভাবনার উৎকেন্দ্রিকতা তথা নিরর্থ কৌশলের যে অত্যপর অবতারণা করেন, তাতে উল্লেখিত হন বিপ্রতীপ করুণানিধান ও শঙ্খ ঘোষ; 'দশমী'র দুটি কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অব্যয়-ব্যবহার সমেত ও একটি কবিতায় বিষ্ণু দে (বাক্তিক্রম হিসেবে)।

'অনুভূতির সাবালকত্ব অর্জন' কবি ও পাঠকের পক্ষে সমান দরকারি। কেন না : 'চারদিকে এত রুচির অস্থিরতা, এত নাবালক-পাঠ্য লেখাকে রৈ-রৈ করে বাজার মাত করতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়'। এর আরও ব্যাখ্যায় লেখক : সাম্প্রতিক সাহিত্যে তথা কবিতায় 'বেলেত্রিস্‌মের সর্বাত্মক আক্রমণ' লক্ষণীয়; ফলে 'কবির হঠাৎ-মনে-হওয়া কোনো ঘটনা যার তাৎক্ষণিক আবেদনটুকুতেই কবি সন্তুষ্ট থেকেছেন তাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ফেলে অথবা দীর্ঘ সময়ের অনুধ্যানে খোঁজেননি তার গভীরতম তাৎপর্য—তাই এত ভাবনার 'তাৎক্ষণিক তারল্য' ও 'বিপুলসংখ্যক সীমিত-আবেদনযুক্ত কবিতা'! প্রসঙ্গত দুটি কবিতার প্রতিতুলনায় লেখক : 'কেউ কথা রাখেনি'র অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যে বাঙালির স্বভাবজ ভাবাবেগপ্রবণতা যেমন দায়ী, তেমনই দায়ী কবিতাকে আবেগের প্রশ্রয় বলে ডাবার প্রবণতা, অথচ প্রকৃতপক্ষে একটা নিরবয়ব অনির্দেশ্য অনুভূতি উদ্রেকের অছিলা হিসেবেই উদ্ভাবিত একটা অবাস্তবতার আবহাওয়া সমগ্র কবিতা-টিকে ঘিরে রয়েছে। (পৃ ৫৭-৮) এবং পক্ষান্তরে : 'নিজের কিছু অনচ্ছ-অগভীর ও অপরিগত অনুভূতিকে স্ফীত করে দেখানোর এই প্রচেষ্টার পাশে রাখা যেতে পারে প্রায় নৈর্ব্যক্তিক ও সরলদর্শন এই ছোট কবিতাটি : দুঃখিত সে নদীর পাশে একটি সবুজ গাছের মতন···/নদীর পাশের সবুজ গাছে ফুটল কি ফুল অনন্তকাল?—অনুভূতির চরিত্র ও তার ব্যবহারের ব্যাপারে এই কবি সাবালক, কারণ ব্যক্তিগত আবেগে নিমজ্জিত না হয়ে···তিনি নিজের ও আবেগ-অনুভূতিপুঞ্জের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করেন, যাতে অনুভূতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।' আর 'এই কবিতাটির পরিগত ও গভীর অনুভূতিই ('শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গির মুন্সিয়ানাই নয়') প্রমাণ করে যে, জনপ্রিয়তার অসতর্ক জিভে প্রায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হলেও দুজনের মধ্যে ব্যবধান কত দুস্তর'। ফলত লেখকের দৃঢ় অভিমত : 'ব্যক্তিকতার স্বৈরাচার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া' বুঝতেই হবে সংকবিকে এবং 'সৎ পাঠককে হতে হবে বিবেচক ও বিবেকী'।

'চিত্রকল্প'-বিচারে সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় চিন্তা : ইন্দ্রিয়বেদ্যতাই নয়, 'চিত্রকল্পকে ব্যাপক অর্থে অনুভূতি-নির্ভর বলে ভাবতে হবে'। ইমেজিস্ট আন্দোলনের সেই 'শুধু দৃশ্যময়'-ভাবা ভ্রান্তির নিরসন করেই হয়েছে, তারপর 'শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ বা স্পর্শেন্দ্রিয়সঞ্জাত চিত্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করার যে-প্রবণতা···তাও সমান সন্দেহজনক'। 'উপরন্তু ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ চিত্রকল্পও রয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি বিচার করে 'মধুসূদনের সেই বহু আলোচিত, নিন্দিত এবং ভুল কারণে নিন্দিত'—'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' এনে লেখক বুদ্ধদেব বসুর মারাত্মক ভ্রান্তি দেখান এজন্য যে, এ-পংক্তি দর্শনেন্দ্রিয়-উৎসাহক মাত্র নয়, 'পংক্তিটির ধ্বনি উদ্বুদ্ধ করে পাঠকের সমগ্র অনুভূতিকে'—রোধ-এর 'ধ' ঘিরে 'ও' ধ্বনির বাধা-পাওয়া ঢেউ আবর্তিত হয়েছে—খুবই তারিফ-যোগ্য বিচার। কিন্তু লেখক বিসর্গযুক্ত রোধকে (রোধঃ=তট) বিসর্গবিযুক্ত করে দেখিয়ে শব্দটির অটল কাঠিন্যকে অনেকটা খুইয়েছেন, ফলে কঠিন তরল বা তটস্থ উদ্বেল-এ তরঙ্গসংঘাত কিছুটা হ্রাস পেয়ে যায়। তবে এই একটিমাত্র পংক্তিই মধুসূদনের সর্বস্ব নয়, হতে পারে না। তাঁর শব্দগত 'উদ্বোধনী ক্ষমতা'র দৃষ্টান্ত "মেঘনাদবধ" ছাড়াও "বীরাঙ্গনা"য় সমধিক এবং "আত্ম-বিলাপে" (লেখক নিজেই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিয়েছেন), চতুর্দশপদীর চারধারে বিকীর্ণ। যাই হোক, আসলে চিত্রকল্পের অপরিহার্যতা যে কবির 'অভিজ্ঞতা-রূপায়ণে যথাযথতা, কল্পনার ব্যাপ্তি ও সমন্বয়ী শক্তি'-নির্ভর, তা নিশ্চিত। অভ্যস্ত চিত্রকল্প ও রূপকধর্মী চিত্রকল্প দৃষ্টান্ত বিচারে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রপ্রসঙ্গ আছে, চিন্তা-উদ্রেক-কারী সত্ত্বেও "হায় চিল"-এর একটি বিশেষ পংক্তি বিষয়ে লেখকের আপত্তি গ্রাহ্য কিনা সন্দেহ। তবে 'বিষয় থেকে স্বাভাবিকভাবে উদীত না হলে কোনো প্রত্যক্ষ বা কল্পিত সাদৃশ্যই উপমার প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হবে না। উপমাশিকার কখনই কবিত্বের পরা-কাষ্ঠা নয়'—মূল্যবান মন্তব্য।

'ভাষা'-শীর্ষক আলোচনায় 'শব্দের দ্বৈত গুণ' বিশেষত তার অর্থাতিগ ছোতনা-গুণকেই কবিতায় সদ্ব্যবহার-যোগ্য বলা হয়েছে। শব্দাবেদনের অবিভাজ্যতা সবচেয়ে বড়কথা নিশ্চয়ই। রূপান্তরিত কবিতার 'রসাভাস'-ব্যাখ্যাটি লক্ষণীয়। 'কাব্যিক ভাষা'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুগ গার্হস্থ্যাশ্রমী কবিদের কথা এসেছে (রাবীন্দ্রিক ভাব ও অনুভব যেহেতু তাঁদের কাছে 'ভান' ও প্রভাবমাত্র)। 'স্বতন্ত্র' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নারী-রূপ-বর্ণনায় মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হয়েছেন। তবে এমন দুই বিপরীত স্থলের তথা মুখ্যত অবজেকটিভ ও সাবজেক-টিভ কবিপ্রতিনিধির এরকম তুলনা সমীচীন কিনা সন্দেহ। 'ধ্বনি'-অধ্যায়ের বিশ্লেষণনৈপুণ্য অনস্বীকার্য, বিশেষত : 'অর্থরিক্ত ধ্বনিবিলাস সাহিত্যে ক্ষয়িষ্ণু-

তার লক্ষণ।' তবে এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র কোনো নতুন দৃষ্টান্ত নন, তিনি তো কৃষ্ণচন্দ্র-রাজসভাশ্রয়ে বাধ্যত 'অমাবস্যার গান' লিখতেই বৃত হয়েছিলেন! 'মল' ও 'ছন্দোস্পদ' অধ্যায়দ্বয়ে লেখকের মুন্সিয়ানা যথেষ্ট মেলে, সবিশেষ সুকান্তর 'স্মৃতির ফেডে' বিশ্লেষণে এবং 'অক্ষরবৃত্তের' দুই সম্ভাবনারই নিপুণব্যবহারী জীবনানন্দ-নিরীক্ষায় (জসীমউদ্দিন এখানে লক্ষণীয়!)। রূপবন্ধ-আলোচনায় মধুসূদনের 'সায়ংকাল'-সনেট-এর ব্যতিক্রমী অন্যাবয়বত্ব আবিষ্কার স্তব্ধ্য এজন্য যে, আলঙ্কারিক শুরু সত্ত্বেও 'সনেটটির আবেদনে এক বিশ্বায়কর আধুনিক স্বর'-এর ব্যঞ্জনা তথা 'রীতিমতো অতিবাস্তব স্বরবিন্যাস-লিপ্টিক' ব্যাপার লেখক টের পান ও সেটি বিশদ করেন।

সমগ্রভাবে বইটি আবেগলেশবর্জিত টানটান স্পষ্ট বিচার-বিবেচনার একটি সুঠাম কাঠামো। মতান্তর ও তর্কযোগ্য যা আছে, তা শেষ পর্যন্ত সযত্ন-সতর্ক লেখকটিকেই নিদ্বিধ প্রমাণ করে, প্রতিষ্ঠা দেয়।

নিখিলকুমার নন্দী

তিন কবির ভুবন

অমিতাভ দাশগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা—কুড়ি টাকা।
কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা—কুড়ি টাকা।
দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা—কুড়ি টাকা।
তিনখানি বইয়েরই প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'? শুনলেই এক আরূঢ় ভনিতায় সমালোচকের কানে-গোঁজা পেনসিল খলিত হয়ে পড়ে। বরং 'নির্বাচিত কবিতা' নামটি অনেক বেশি ইশারা দেয়। বিশেষ রীতিপ্রকরণের কবিতাকে বরং এক মলাটের আঁচলে পেয়ে পাঠক তাঁর প্রয়োজনকে খুঁজে নিতে পাবেন। এখন 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কিন্তু কী অর্থে শ্রেষ্ঠ? এই দুরূহ প্রশ্নের সামনে নির্বাচক অসহায়ভাবে জনপ্রিয় কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। তবু 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সিরিজের প্রবর্তন করে দে'জ যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা অভিনন্দনের, কারণ একজন কবির মোটামুটি একটা পরিচয় এ গ্রন্থে পেয়ে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, অমিতাভ দাশগুপ্ত আর কবিতা সিংহের দক্ষিণ হস্তের উদারতায় ইতিপূর্বেই বাঙলা কবিতা এক অন্যতর বাঁক নিয়েছে। গ্রন্থ দুটিতে সে স্মৃতি রয়ে গেল। আর দিব্যেন্দু পালিতের প্রধান পরিচয় কথা-সাহিত্যিক হলেও তাঁর কবিতায়ও বহুবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেইসব পঙ্‌ক্তি যা শিল্পময় আর সুন্দর।

টি. এস. এলিয়ট একবার বলেছিলেন, আধুনিক কবিরা কবিতার মামুলি অর্থকে একখণ্ড মাংসের মতো পাঠকের বুদ্ধিরূপী কুকুরটির দিকে ছুঁড়ে দেন, যাতে বুদ্ধির পাহারা এড়িয়ে কবিতাটি তাঁর হৃদয়কক্ষে প্রবেশ করতে পারে। এখন তর্ক উঠবে, গবেষণার দক্ষতা আর স্বেদ-ঝরানো শ্রমের অবসানে অর্থ উদ্ধারের পর মনের আর কতটুকু অবশেষ রইল কবিতাটিকে হৃদয় অবধি বহন করবার? আসলে কবিতা যদি প্রথম স্পর্শেই রোমাঞ্চ না জাগাতে পারল, তবে বুদ্ধি আর বিদ্যার হাজার গলিপথ ঘুরেও শেষে কিছুই পাবে না।

আমাদের পক্ষে সুখের কথা, অমিতাভ দাশগুপ্ত কবিতা লিখতে বসে আচ্ছাদননির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন নি। কারণ তিনি কবিতা লিখছেন সুদূর অতীত থেকে বয়ে আসা রক্তের ভিতরে প্রবাহিত এক মহূয়াত্ববোধের তাড়নায়। 'একটা দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ / তেতাল্লিশের মন্বন্তর / ছেচল্লিশের দাঙ্গা / ডানাভাঙা স্বাধীনতা / উনপঞ্চাশের ঝড় / উনষাটের ভূখমিছিল / আর / সত্তর-একাত্তরের যুবমেধের দুকুল ওপচানো স্মৃতি' নিয়ে। যার অপর পাড়ে একই সময়ে তুমুল হাততালিতে শব্দ নিয়ে এক ছেলেখেলা হচ্ছে, সাঁপুড়ের বাঁশির মতো এক নেশা-টান ডাকছে ধলভূমগড়ে। না, অমিতাভ তাতে মজে যান নি। বরং আপন অন্তরলোকে ভেসেওঠা যে চর, তাঁরই স্বদেশ, তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার ভূমি। মানুষের কান্না, ঘাম আর রক্ত মিশে উর্বর হয়ে উঠে যে মাটি সকলকে খেতে দিয়েছে। যে তার প্রতি বিমুখ তাকেও আশ্রয় দিয়ে আছে। কিন্তু অমিতাভ যে স্পর্শ না করে কিছু লিখতে চান না। 'আপনারা তো সকলেই জানেন, / কারো চোখ না দেখতে পেলে / তাকে নিয়ে কবিতা লেখা কতখানি মুশকিল!'

পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রথম থেকেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন সামাজিক দায়ের এই নির্মম কেতনটি। এবং তিনি জানতেন 'এ খেলায় / চাল ফেরত নেই। / কোমরবন্ধ থেকে যে একবার বেরিয়ে গিয়েছে / রক্ত না দেখে তার ফেরা বারণ।' তিনিও ফেরেন নি। তাই তাঁর কবিতা যত দিন যাচ্ছে ততই অমোঘ হয়ে উঠছে আমাদের জীবনযাপনে আর রণে, চামড়ার নীচে আটকে-থাকা পেরেকের গোপন উৎসে।

আত্মরতির উৎসব থেকে দূরে চলে গিয়ে তিনি লিখেছেন মানুষের খিদের কথা, তৃষ্ণার কথা, ভুলের কথা, জয়ের সংবাদ। পড়তে গিয়ে পাঠক বলে ওঠেন—'আমি, আমি'। 'এত ফুল থাকতে বাগানে / তুই কি না বেছে নিলি কামিনী।' অমিতাভর এই নির্বাচনে লাভ হয়েছে বাঙলা কবিতার। অজস্র অপচয়ের মধ্যে একটি যথার্থ দান।

'পুতের ভায়ের মত পাঁচটি সোনার ছা / আশ মিটিয়ে মাস খেয়েছে উদলা করে গা।' তিনি শুধু কবিতা লিখতেই চান নি। শহুরে, শিক্ষিত, সর্ববিষয়ে সিনিক লোকেরা নন, তাঁর কবিতায় যাঁরা ঘুরে বেড়ান—তাঁদের গায়ে ঘামের গন্ধ, ফসলের দাগ, ফাঁসির দড়ির ছায়া, বুলেটের ক্ষত। অথচ এসব নাকি কবিতার চিন্ময়তার ক্ষতি করে? হয়তো! কে জানে!

আসলে তাঁর ভাষা, বিদেশী শব্দকেও মুঠোয় ভরে নেওয়া, যা সম্পর্কে নতুন কিছু বলা অনাবশ্যক এবং ছন্দজ্ঞান সম্পর্কেও। শুধু একটি উপমার উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। মাংস এসেছে বাড়িতে। 'একটু চাখো তো দেখি' বলার আগেই / তিনটি জিভের মত বেরিয়ে এসেছে তিনটি ডিশ।" ভাবা যায়?

আগামী প্রজন্মের কবিদের জন্যে অমিতাভ সঞ্চিত রেখে গেলেন এক মূল্যবোধ আর অভিজ্ঞতা। কিভাবে মানবিক হয়ে উঠতে পারে কবিতা। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রেষ্ঠ দান।

নারীর অনুভবকে, তার চেতনা এবং সাম্প্রতিক উন্মীলনের প্রকাশকে অনুপম দক্ষতায় উপহার দিয়েছেন কবিতা সিংহ। সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি দক্ষতার এক সীমাহীন কিনারে পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁকে পর্যন্ত করা অন্য কবিদের সাধ্যাতীত। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তিনি শুধু নারীর অনুভবকেই কবিতায় স্থান দিয়েছেন। আমি বলতে চাইছি, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও এবং কাগুজে বুলিতে নারীমুক্তির বিভিন্ন প্রচারের জৌলুসের মধ্যেও বাঙলা কবিতায় নারীর অনুভব বিস্ময়করভাবে অবহেলিত হয়েছিল। কবিতা সিংহ তার অবসান ঘটিয়েছেন আপন দক্ষতায়। আর এই মৌলিক পথরেখাটির উন্মোচনে তিনি উজ্জ্বল হয়ে রইলেন। 'কিছু কি আলাদা রাখো? / শমীবৃক্ষে রমণী হে একা? / সত্যকার এলোচুল সত্যকার রমণী-নয়ন / সত্যকার স্তন? / খুলে রাখো নিজস্ব-ত্রিকোণ?' কিন্তু পৃথিবী এসব দেখে না। 'কিম্পুরুষের সঙ্গে ঘটে যায় পৃথিবীর / সমস্ত অফলা সঙ্গম!'

কবিতা সিংহের কবিতায় প্রায়ই গল্পের আবেশ লক্ষ করেছি। আসলে শুধু কবিতা নয়—গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং গদ্যভূমিতেও তিনি সফলতার সঙ্গে বিচরণ করে চলেছেন। তারই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর কবিতায়। ফলে তা হয়ে উঠেছে বহুমুখী। পাঠকও ক্লান্তি থেকে মুক্তির সুযোগ পেয়েছেন। নানা বাস্তব চরিত্রও এসে তাঁর কবিতায় উপস্থিত হতে পেরেছে। কেয়া চক্রবর্তী দেবব্রত বিশ্বাস-এর মতো কিংবদন্তীর মানুষগুলি তাঁর কবিতায় জীবন্ত হয়ে রইলেন, এজন্য পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবেন আশা করা যায়।

কবিতার বিষয় যে কোনো-কিছুই হতে পারে—মনে হয়েছে কবিতা সিংহ এমনটিই বিশ্বাস করেন। "ঝুমকা গিরা রে…" এর মতো জনপ্রিয় হিন্দি ছায়াছবির গানকে তিনি কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন 'বেরিলির বাজারে ঝুমকো-জোড়া হারিয়ে এলি' ইত্যাদি। এসব হয়তো তর্কের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাঁর সাহস এবং ছন্দ নিয়ে কুট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ কথা প্রমাণ করে জনপ্রিয়তা অর্জনের সোনার হরিণের পিছনে না ছুটে তিনি কবিতা-পরমেশ্বরীকে তাঁর সাধ্যমত আভরণে সজ্জিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। হয়তো এর ফলে কবিতার সমাজপতিদের ভ্রূকুটি এবং শাসন-তর্জন তাঁর প্রাপ্য হল, কিন্তু তরুণ কবিদের কাছে তিনি পেয়েছেন পূর্বসূরির শ্রদ্ধা আর সম্মান।

দুটি কাব্যনাটকের সংযোজন গ্রন্থটির ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং কবিতা সিংহের কবিতার বিস্তীর্ণ জগৎ চিনতে তা পাঠককে সাহায্য করবে।

কবি হিসাবে দিব্যেন্দু পালিত কখনই খুব জনপ্রিয় হন নি, তাঁর কথাসাহিত্য নির্মাণের খ্যাতির আড়ালে ম্লান হয়ে গেছে কবিতার মুখ। তবু কি এক অমোঘ আকর্ষণে তিনি কোলাহল, হাততালি আর আর মঞ্চের পাদ-

প্রদীপের আলো থেকে দূরে, নির্জনে, একান্ত গোপনে বসে যেন নিজের আত্মার প্রতি অঙ্গীকারে একের পার এক কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন। এ বড়ো কম কথা নয়। ভিতরে উৎসের যথেষ্ট চাপ না থাকলে এমনটি হওয়া সম্ভবও নয়। স্বভাবত তাঁর কবিতা গভীর, আত্মস্থ। বিঘ্ন কিন্তু ঐশ্বর্যময়। ছোটো-ছোটো কারুকাজের।

'সমস্ত সম্বিৎ চুরি হ'য়ে গেল আলো অন্ধকারে / বাল্‌বের চতুরর্ধাঁধা পার হ'য়ে / ঠাণ্ডা অদৃশ্য কার হাত / অতর্কিতে টেনে নিল আমাকে বায়ুর শূন্যে।' এক অদৃশ্য টানে এ ভাবেই তিনি কবিতায় মগ্ন হন। এই আবহের অন্তরালে হয়তো এক গল্প ছিল, কিন্তু কবিতায় আক্রান্ত হতে গিয়ে গল্পটি আর মনে থাকে না। এক অশরীরী মূর্তির মতো তাকে তখন কিছু দেখা যায়, কিছুটা যায় না। আর এই অকথিত অনুভব দিব্যেন্দু পালিতের কবিতাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, আলাদা করে রেখেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বা শব্দ নিয়ে পবিত্র ব্যবহার হয়তো নেই, কিন্তু এই হতাশাটুকু কাটিয়ে উঠি যখন দেখি টর্চ ফেলে পাঠককে তিনি অবচেতনের গভীর সোপানে ধীরে-ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন মনে হয় বহিরঙ্গের উপাসনায় না গিয়ে এই কবি এক দুরূহ আবিষ্কারে মগ্ন হতে চেয়েছেন। 'পাথর পাথর ; বক্র নদীর সততা মেনে যেতে-যেতে / হঠাৎ ঝর্ণায় / কোমর বাঁকিয়ে ওঠে, জন্মে উপবীতে তার এর চেয়ে যোগ্য / আর স্মৃতি নেই কোনো।' বোঝা যায় সময়ের পাথর ক্ষয়ে এলে এই কবির কবিতায় আমরা খুঁজে পেলেও পেতে পারি কিছু রত্ন, সূক্ষ্ম-কারুময়।

গ্রন্থ তিনটি মুদ্রণসৌকর্য আর প্রচ্ছদের জন্যে একটি বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। সুব্রত সরকার

শরীরমাদ্যম্

আপনার কুশল (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী।
ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী—আবদুল হক খন্দকার।
অ্যাকাডেমিক শিরঃপীড়া ব্যুরোপ্যাথি ও অন্যান্য—ফরহাদ খান।

সব কটি বইয়েরই প্রকাশক মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বইগুলি সম্পর্কে প্রথমেই লসাণ্ড মন্তব্য রাখি। ডাঃ শুভাগত চৌধুরীর বই দুটি যত্ন করে হাতের নাগালে তাকে তুলে রাখার মতো। অর্থাৎ যাতে প্রয়োজন হলেই তৎক্ষণাৎ নামিয়ে দেখে নেওয়া চলে। আবদুল হক খন্দকারের বইটি আবার নিজের বা পরের টীনএজার ছেলেমেয়েদের হাতে চোখ বুঁজে উপহার দেওয়ার মতো। অন্যদিকে ফরহাদ খানের বইটি শুধুমাত্র একা পড়ে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। নিজে পড়ে আবার অফিসের বন্ধুদের পড়াতে হবে ; এবং কর্তাগিন্নী এটি দুজনে মিলে পড়বেন, তবেই সত্যিকারের তৃপ্তি—সুতৃপ্তি। লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, বুড়ো বয়সে আমিও তাই করেছি।

"আপনার কুশল" দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ডে শুভাগত চৌধুরী লিখেছেন পাকা ডাকতারের মতোই, যা তাঁর কাছে অবশ্যই প্রত্যাশিত। এমনকি চেষ্টাও রেখেছেন চিকিৎসকসুলভ অ্যাকাডেমিক নিস্পৃহতার নির্মোকে নিজেকে সর্বদাই আবৃত রাখতে। তবে এসব প্রয়াসে কি ভেতরের জাত-লিখিয়েকে চেপে রাখা যায় ? মাঝে-মাঝেই ঝিলকিয়ে উঠেছে এ ধরনের বাক্য—সুষম 'খাদ্য অন্ধশাস্ত্র নয়, চার্টের মাধ্যমে সুষম খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করলে খাওয়ার আনন্দই যায় হারিয়ে' ; কিংবা—'বেদনার এই নীল ভুবনের অন্ত নেই' ; অথবা যেমন রাইটার্স্‌, ক্র্যাম্প্‌, নিয়ে আলোচনার সূত্রে এক জায়গায় লিখছেন—'লেখকের পাণি-পীড়া নেহাৎই চাঁদের কলঙ্ক··· এজন্য লেখকের পাণি-পীড়নে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।'

"আপনার কুশল"-এর দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ডে অনেকগুলি ডাকতারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ডাকতারবাবু। যেমন দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—ঠাণ্ডা লাগা, পেটের অম্লজনিত ঘা, নানা ব্যথা-বেদনার মূল কথা এবং প্রতিকার, ম্যালেরিয়া, গর্ভকালে মায়ের ব্যবস্থা, অ্যালকোহলিজম, অরগ্যান ট্র্যান্‌স্‌প্ল্যান্ট্‌, এমনকি লেসার রশ্মি, বায়োনিক ম্যান ইত্যাদিও। তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ব্যায়োফীডব্যাক, আঙু-পাংচার, হৃৎপিণ্ড, মানসিক চাপজনিত ব্যারাম, সেরিব্রাল পক্ষাঘাত, জলাতঙ্ক, শীত ও রোগভোগ, বহুমূত্র, ক্যান্সার, সর্পদংশন-প্রসঙ্গ, মৃগী, জিয়ারডিয়া, এইড্‌স্‌ ইত্যাদি। ডাঃ চৌধুরী সচেতনভাবেই লেখাগুলির পরিসর ছোটো রেখেছেন যার দ্বারা একজন দাড়ি কামাতে-কামাতেই কিংবা কাঁচা তরকারি কড়াইতে ঢেলে ঝোল

ফুটে উঠবার আগেই একটা বিষয় পড়ে ফেলতে পারেন।

ডাঃ শুভাগত চৌধুরীকে সাধুবাদ দিই—তিনি শক্ত কথা শুধুমাত্র নির্ভুলভাবেই বলেছেন তা নয়—বলেছেন একান্ত সহজ, ঘরোয়া আপন মানুষের ভাষায়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, শক্ত বিষয় শক্তভাবে সকলেই বলতে পারেন কিন্তু শক্ত বিষয় সহজ-ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন কোটিকে গুটিক। ডাঃ চৌধুরী সেই বিরল দক্ষ শিল্পীদের একজন।

বেশি কথা কী, আমি নিজেও তো নানা ডাকতারি বিষয় নিয়ে ছ-সাত বছর ধরে একাদিক্রমে লিখে যাচ্ছি—কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর মতো লিখতে পারলুম কই ? তাই সর্বান্তঃকরণে শুভাগতের শুভাগমনকে সুস্বাগতম্‌ জানাচ্ছি।

তবুও দু-একটা বিষয়ে অভিযোগ না জানিয়ে পারছি না। এত সুন্দর—প্রতি ঘরে রেখে দেওয়ার লেখা—কিন্তু বইয়ের কাগজের এমন দুর্দশা কেন ? স্থানে-স্থানে এফ পৃষ্ঠার ছাপা অপর পৃষ্ঠাতেও ফুটে উঠেছে। নাহয় প্রকাশক আরেকটু ভালো কাগজেই ছাপাতেন ওটা ! এবং নাহয় দাম আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়ে ওটা উশুল করে নিতেন ! দ্বিতীয় অভিযোগ, লেখকের কিঞ্চিৎ 'জঙ্গী' বাঙালি মনো-ভাবের বিরুদ্ধে। যেমন 'Behaviour therapy'র বাঙলা প্রতিশব্দ বানিয়ে সেটিকেই ব্যবহার করেছেন—আচরণ-চিকিৎসা হিসেবে ; কিংবা 'Relaxation' এর বদলে ব্যবহার করেছেন—'শিথিলতা কৌশল'। এটা কেন ? টেকনিক্যাল শব্দের বাঙলা অনুবাদ নিশ্চয়ই ব্যবহার হবে। কিন্তু অনুবাদ যদি মূল ইংরেজির চেয়েও খটমটতর হয়ে ওঠে, তাহলে আর সার্থকতা কোথায় ?

একটি বিশেষ অনুবাদ তো দস্তুর-মতো কানে 'খট' শব্দ তুলল। অনেক সময় রোগীকে তুষ্ট করার জন্য লাল-নীল জল, বড়ি বা ক্যাপসুল দেওয়া হয় শুধুমাত্র রোগীর মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই। এগুলির ডাকতারি নাম—'প্লেসিবো' (placebo)। ডাঃ চৌধুরী এটির প্রতিশব্দ করেছেন—'ছদ্ম-ওষুধ' এটি ঠিক কি ? "ছদ্ম" শব্দটি সেভাবে কি ব্যবহার করা চলে ? "ছদ্ম-বন্ধু" বলতে কি বন্ধুর ছদ্মবেশে শত্রু বোঝায়, না, "বন্ধুর চেহারায় না এলেও আসলে বন্ধুই"—এ ধরনের ব্যাপার বোঝায় ? যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে প্লেসিবো-র অর্থ "ছদ্ম-ওষুধ" নয়। কারণ প্লেসিবোর বেশবাস অন্য, অথচ সেটি আসলে ওষুধই—তা নয়, কারণ এটির বেশ যদিও ওষুধের, কিন্তু এটি আসলে নির্গুণ নির্বিকার বস্তু। "ছদ্ম" ও "কপট"—এক কথা তো নয় ! তাই বলি কী, "প্লেসিবো" "প্লেসিবো"ই থাক-না ! এ যেন অকসিজেনকে উজ্জান বলে খামোখা বাঙালিয়ানা ফলানো।

"ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী" বইটিও বেশ লিখেছেন আবদুল হক খন্দকার। ভাষা ঝরঝরে, সুখপাঠ্য। এডওয়ার্ড জেনার, এগনস্ক সেমেলওয়াইজ, রবার্ট কখ, ফ্রেডারিক ব্যানটিং, গেরহার্ড ডোম্যাগ, আলেকজানডার ফ্লেমিং প্রমুখ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্ববিশ্রুত নামগুলির এবং তাঁদের কালজয়ী আবিষ্কারের কাহিনী বিধৃত হয়েছে এই বইয়ে। সঙ্গে রয়েছে নানা বিজ্ঞানীর ছবিও। আগেই বলেছি, এ বই যে-কোনো টীন-এজারকে স্বচ্ছন্দে উপহার দেওয়া চলবে, তবে কথাটা বলে লেখককে উঁচু নাক দেখাচ্ছি না। বড়োরাও এটি পড়ে আনন্দ পাবেন খুবই। তবে তাঁরা হয়তো এ বিষয় নিয়েই বেশ কিছু লেখা ইতিমধ্যেই দেখেছেন। কলকাতায় ডাঃ বিশ্বনাথ রায় এবং আনন্দকিশোর মুন্সী একা-ধিক ভালো বই লিখেছেন সমানই সুখপাঠ্য ভাষায়। তবে টীনএজাররা এ বই পড়ে শুধু শিখবে এবং আনন্দ পাবে তা নয়। জীবনের কঠোর এবং পশ্চাদ্‌মুখী সংস্কারের চেহারাটা যে কতটা নির্মম হতে পারে তা দেখতে পাবে।

কুসংস্কার শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ-কেই নয়, তা-বড়ো তা-বড়ো বিজ্ঞানী-দেরও যে সেটি অন্যভাবে আচ্ছন্ন করে, তার অজস্র প্রমাণ রেখেছেন খন্দকার সাহেব। এবং এ কু-সংস্কার বিজ্ঞান-বিরোধী না হলেও বস্তাপচা ভুল চিন্তাকে আঁকড়ে থাকার এক নতুন ধরনের কু-সংস্কার ! যেমন, আলেক-জানডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালেই পেনি-সিলিন আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ পর্যন্ত বহুদিন প্রকাশ করতে অনুমতি দেন নি তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার—রাইট ! অথচ রাইট নিজেও ছিলেন নামী বিজ্ঞানী। অবশেষে আবিষ্কারের অন্তত এগারো বছর পরে ফ্লেমিং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে সচেতন করতে সক্ষম হন।

এই বই পড়লে ছোটোরা অন্তত বুঝবে যে বড়ো কাজে বাধাবিপত্তিকে ভয় পাবার কিছু নেই এবং সত্যিকারের সৎ প্রচেষ্টার জিত শেষ পর্যন্ত হবে !

তবে খন্দকার সাহেবের বইয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ,

কোনো এদেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীর কথা এতে অনুপস্থিত কেন? 'ওরিয়েন্টাল সোর'-এর ওষুধের আবিষ্কর্তা ডাঃ জে সি রায়, কিংবা কালাজ্বরের ওষুধের আবিষ্কর্তা ইউ এন ব্রহ্মচারীর কথা এতে অনুপস্থিত কেন? আশা করি পরবর্তী কোনো সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হবে।

ফরহাদ খান-এর "অ্যাকাডেমিক শিরঃপীড়া ব্যুরোপ্যাথি ও অন্যান্য" পড়বার সময় ছোটোবেলায় সারকাস দেখে ফিরে আসার সময় ছোটোকাকা যা বলেছিলেন তা স্মরণে এল। তিনি বলেছিলেন—ওই মুখে-রং-মাখা বিচিত্র-পোশাক-পরা যে জোকারদের দেখলি, ওরা আসলে সাধারণ কসরতকারীদের চেয়েও অনেক বড়ো ওস্তাদ। আর অত বড়ো ওস্তাদ বলেই দমকাটা হাসি হাসাতে-হাসাতেই অবলীলাক্রমে আরও শক্ত খেলা দেখায়!

ফরহাদ খান নিতান্ত হালকা চালেই মূলত চিকিৎসার নানা দিক ধরেছেন। অথচ বিষয়গুলি খুবই সিরিয়াস! এ যেন আধ ডজন আধমনী লোহার বল নিয়ে হাসতে-হাসতে লোফালুফি খেলা! ওজনদার ভারি তথ্য আর তত্ত্বের পাশাপাশি যখন তখন নানা মুচমুচে খবরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন ফরহাদ খান। যেমন—প্রিয় পাঠক কি জানতেন যে নেপোলিয়নের প্রথম স্ত্রী জোসেফিনে কিনেছিলেন এক ওয়াংওটাং, এবং যে কোট টাই পরে দস্তুরমতো রানী-সাহেবারই টেবিলে বসে খাবার খেত? কিংবা—রোম সম্রাট ক্যারাকেল্লা একটি সিংহকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতেন এবং ওই সিংহকে চুম্বন করা ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস? কিম্বা প্রিয় পাঠক কি জানতেন যে "এভিউর্স মাম্বল্" বলে এক ধরনের রোগ রয়েছে? এবং খবরের কাগজের সম্পাদকরা মনে-মনে এটা সেটা বলতে-বলতে শেষ পর্যন্ত বিড়বিড় করে নিজের মনে বকবক করাই তাঁদের দ্বিতীয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়? কিংবা পুরনো জারমানিতে কোনো মেয়ের সঙ্গে একই খোলা ছাতার তলায় দুজনে বাড়িতে এলে, ছেলের অভিভাবকরা ধরে নিতেন ওদের বিবাহ স্থির? কিংবা, অসট্রিয়ায় কোনো প্রেমিকা তার প্রেমিককে বদ্ধ ছাতা দেখালেই বোঝা যেত মেয়েটি আর সম্পর্ক রাখতে চায় না?

যদিও মূলত বহু ধরনের ডাকতারি বিষয় নিয়েই ঘেঁটেছেন ফরহাদ খান, তবুও পাঠককে সাবধান করে দিই, শুধু ডাকতারি বিষয় খুঁজে পাওয়ার জন্যই এই বই হাতে নিলে তিনি হতাশ হবেন। তবে অন্য দিক দিয়ে আবার ওই নিরাশা বহুগুণে পুষিয়ে যাবে। কারণ এ হল হিন্দু ঘরের বিধবা পিসিমার রান্না! হয়তো সামান্য ডাল বা ঝোল বা চচ্চড়ি। কিন্তু শুধু রাঁধবার গুণে অশোকা হোটেলের মোরগ-মসল্লামকেও হার মানায়! এতে 'নিউট্রিশন' খুঁজতে গেলে বিফল হবেন হয়তো, কিন্তু জিবে স্বাদের তার বহুদিন পর্যন্ত জল ঝরাতে থাকবে!

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

সুন্দর স্মরণিকা : ঐতিহাসিক দলিল

স্মরণিকা—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

সাধারণভাবে অধিকাংশ স্মরণিকা তাৎপর্যহীন বলেই আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স তাঁদের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গেল ২৫শে জুলাই, ১৯৮৭-র এক আনন্দসন্ধ্যায় যে স্মরণিকা প্রকাশ করেছেন তা ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রণ-সৌকর্যের স্নিগ্ধতায় গ্রন্থটি সুন্দর এবং হাতে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রশংসাবচনের অবিরলবর্ষণ অবধারিত। প্রকাশনাটির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। কত অজানা তথ্য, মূল্যবান স্বতিচারণ, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র, বিখ্যাত লেখকদের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশের হুবহু প্রতিলিপি এই স্মরণিকাকে দলিলের মর্যাদা দান করেছে।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশনা-সংস্থার আবির্ভাবকাল ১৯১০ সাল। আজ এর বয়স সাতাত্তর বছর। সুদীর্ঘ এই সময়ে কত বরণীয় সাহিত্যিকদের স্মরণীয় কীর্তি এঁরা প্রকাশ করে এসেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্যিকদের সম্পর্ক যে কত সুচারু ছিল তার প্রমাণ অধিকাংশ স্মৃতিকথনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রখ্যাত সাহিত্যরচয়িতাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং রাধারাণী দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন। এঁরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ সুধীরচন্দ্র সরকার প্রসঙ্গে আন্তরিক কথোপকথনে যেন এঁদের পুরনো দিনগুলিকে মূর্ত করে তুলেছেন। এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখকরাও এই সময়ের কর্ণধার সুপ্রিয় সরকারের কাছে সেই একই ঘরানার ব্যবহার পেয়ে আসছেন।

'আমাদের কথা' প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। কিন্তু তার মধ্যেও অনেক উপাদান রয়েছে যা সাহিত্য-গবেষকদের কাছে মূল্যবান। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা "সন্দেশ", কিন্তু সে বছরই ১৯২০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোরপত্রিকা "মৌচাক" প্রকাশ শুরু করল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। এই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখেরাও লিখেছিলেন। অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে কত অজানা ঘটনাও নিবেদিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুর "গড্ডলিকা" গ্রন্থের একটি চমৎকার আলোচনা লিখেছিলেন একটি চিঠিতে। সম্পূর্ণ চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে কবির হাতের লেখায়। আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বইখানির নাম "গড্ডলিকা প্রবাহ"। ভয় ছিল পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে,—কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকাপ্রবাহের অন্ত নাই।' সমস্ত চিঠিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ পরিহাসপ্রিয়তাও লক্ষণীয়।···শরৎচন্দ্র তাঁর "গৃহদাহ" উপন্যাসের ইংরেজি তরজমা শুরু করেছিলেন—তার কিছুটার হুবহু প্রতিলিপি ছেপে দেওয়া হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, রাজশেখর বসু প্রমুখের হাতের লেখাও পেয়ে যাই গ্রন্থটিতে।

আজকাল বইয়ের প্রচ্ছদচিত্রটি মনোরম করে তোলা যে-কোনো প্রকাশকের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিতান্ত আটপৌরে লেখায় গ্রন্থের আর লেখকের নাম মুদ্রিত থাকত প্রচ্ছদপটে। এম সি সরকারের উদ্যোগেই মলাটে প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি মুদ্রিত হতে থাকে। স্বভাবতই বহু পুরোনো নতুন বইয়ের মলাটের প্রতিচিত্র এবং শিল্পীর নাম স্মরণিকাটিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত গ্রন্থটির মধ্যে শোভনতা এবং সুরুচির পরিচয় 'ফুটে' উঠেছে। পরিকল্পনার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। চমৎকার প্রচ্ছদপটের প্রকল্পনা প্রখ্যাত শিল্পী চারুখানের। অলংকরণ ও ফটোগ্রাফে শিল্পীকে সহযোগিতা করেছেন অমিতাভ খান ও নির্মল দাস।

এই সুন্দর 'স্মরণিকা' দামের বিনিময়ে যদি সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন প্রকাশক, তাহলে অনেকে উপকৃত হতে পারতেন। এই গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে শুধু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সম্পাদক, শিল্পী এবং সাংবাদিকদের হাতে।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

একটি গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে

চতুরঙ্গ অগস্ট (১৯৮৭) সংখ্যায় শ্রীউৎপলকুমার গুপ্তের "জানালা" উপন্যাসটির সমালোচনায় গ্রন্থটিকে 'অনুকরণ' বলে সমালোচক উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের প্রতিবাদী বক্তব্য: 'সমালোচক যা ভালো বুঝেছেন তা করেছেন। আর আমার উপন্যাসটি এমন কিছু আহামরি হয় নি যে তার সপক্ষে জোরালো যুক্তি রাখব। শুধু একটি ব্যাপারে আমার চেয়ে আর তো কেউ নেই যিনি বুঝবেন এর সত্য দিকটা। দুঃখের ভার বুকে নিয়ে জানাই উপন্যাসটির পরিকল্পনা আমার নিজস্ব। এর চেয়ে পবিত্র সত্য আর হয় না! আমি আগে কোনোদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "শ্যামসাহেব" পড়ি নি। আর যদি-বা পড়তাম, তাহলে কি এই কর্ম একজন সচেতন লেখককে মানায়? এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।'

সমালোচক শ্রীহিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য: 'যেহেতু "শ্যামসাহেব" (১৯৮৩) "জানালা" (১৯৮৫)-র আগে প্রকাশিত এবং দুটি উপন্যাসেরই কাহিনী, চরিত্র, সমস্যা, সংকট, এমনকি গতিবিস্তারবর্ণনাতেও এক অদ্ভুত সাদৃশ্য এসে গেছে, "জানালা"কে "শ্যামসাহেবে"র হুবহু অনুকরণ বলতে আমি দ্বিধা করি নি। শ্রীগুপ্তর চিঠি পড়ে জানলাম তিনি "শ্যামসাহেব" পড়েন নি।···বিশ্বসাহিত্যে কল্পনার সাযুজ্য বা চিন্তার একমুখীনতার এইরকম বিপর্যয় বারে বারে ঘটে গেছে। অথচ দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত অনুকরণ বা অনুসরণ নির্ণয় করবার কোনো পাকা সিদ্ধান্ত আলোচকদের হাতে পৌঁছয় নি বলে আলোচককেও কম বিব্রত হতে হয় না। যে-কোনো দেশের সাহিত্যে শক্তিমান বা সমসাময়িক কালে বহুল প্রচারিত লেখককে ঘিরে একশ্রেণীর যশঃপ্রার্থী অনুকারী লেখকের দৌরাত্ম্য চলে। বাঙলা সাহিত্য তার উর্ধ্বে নয়। আর আমি যেহেতু শ্রীগুপ্তর "জানালা" ব্যতীত যত দূর মনে পড়ে কোনো গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচিত নই, তাই তাঁকে কথাসাহিত্যে নবাগত তরুণ বলে চিহ্নিত করেছি।'

চতুরঙ্গর সম্পাদকীয় বিভাগের তরফে আমরা শ্রীউৎপলকুমার গুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্যকে স্বাভাবিক সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমাদের আশা, এই নিয়ে সমস্ত ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হবে।

ধূপ, রজনীগন্ধা ও বাঙালির সংস্কৃতি

সনাতন মিত্র

খবরের কাগজ থেকে একটি খবর উদ্‌ধৃত করে আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। গত তেসরা সেপটেমবরের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র খবরটি বেরিয়েছিল। ওই একই দিনের "স্টেটসম্যানে"ও খবরটি বেরোয়।

কলকাতা পুরসভার একজন কর্মকর্তাকে এই প্রশ্নটি করা হয় :

'আপনি তো পরিবেশ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মেয়র-পরিষদের সদস্য। আপনি কি মনে করেন না রঙন স্কোয়ারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজার অডিটোরিয়াম তৈরি করে আপনারা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছেন?'

উত্তর : 'পরিবেশের ভারসাম্য যে কিছুটা নষ্ট হচ্ছে তা ঠিক। কলকাতার পরিবেশও বর্তমানে আশঙ্কাজনক। কিন্তু কলকাতা ভারতে সংস্কৃতির পীঠস্থান। সে হিসেবে দুটি প্রয়োজনের তুলনা করলে মনে হয় পারকের স্থলে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করাটাই যুক্তিযুক্ত।'

সংস্কৃতির "পীঠস্থান", অর্থাৎ প্রধান-প্রধান কেন্দ্র ভারতে আরও আছে, কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির যে কলকাতাই রাজধানী, তাতে কোনো ভুল নেই। সেই মহানগরীর একজন পৌরপিতা, যাঁর ওপরে শহরের পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার, তিনি যে সংস্কৃতিকে দূষণমুক্ত মনোরম পরিবেশের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ শহরের পরিবেশের যাঁকে বলা যায় অভিভাবক, এমন-কি তিনিও সংস্কৃতির খাতিরে শহরের বর্তমান "আশঙ্কাজনক" পরিবেশকে আরও কলুষিত হতে দিতে সম্মত, মনে হতে পারে বাঙালির সংস্কৃতি-প্রেমের এ এক চূড়ান্ত প্রমাণ। প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, যাকে ভালোবাসি তার জন্য কী পরিত্যাগ করতে রাজি আছি, তাই দিয়ে। কলকাতাবাসী নির্মল বাবু, সুনীল আকাশ, সবুজ গাছপালা, নাগরিক পরিবেশের মধ্যেও তার যতটা রক্ষা কিংবা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, তার আশাকে বলি দিতে প্রস্তুত সংস্কৃতির বেদীমূলে। 'এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।'

বাঙালির সংস্কৃতি-ভালোবাসাও কতকটা প্রতাপের শৈবলিনীকে ভালোবাসার মতো, দেহসম্পর্করহিত। কিন্তু সে কথা পরে, আপাতত জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষার কথাটাই বেশি মনে হচ্ছে। কলকাতার জল-বায়ু, কলকাতার মানুষের জীবনযাপনের পরিবেশ, জীবনধারণের অনুপযোগী হয়ে উঠুক পরোয়া নেই; জয় হোক বাঙালির সংস্কৃতির! ভারতেও রোমাঞ্চ লাগে, ভবিষ্যতের দিকে খুব বেশি দূর যাবার দরকার নেই, দেখছি, সিগারেটের প্যাকেটের ওপর যেমন থাকে, কলকাতা মহানগরীর সবকটি প্রবেশপথের ওপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা আছে, 'সাবধান! এই শহরে প্রবেশ আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে।'

বাঙালির সংস্কৃতি-প্রেমের এই একটা দিক দেখলাম, ত্যাগের দিক। সংস্কৃতির স্বার্থে সে নিজের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ আয়ুর আশা শুধু নয়, একটা মস্ত বড়ো শহরেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির যতটুকু স্পর্শ আকাশকুসুম-কল্পনা বলে এখন বিবেচিত হয়

সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য

না, তার লোভও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। ইংরেজি "স্প্যান" পত্রিকায় গত জুলাই মাসে নিউ ইয়রক শহরের সেনট্রাল পারকের একটি কোণের একখানি ছবি ছাপা হয়েছিল। সবুজ নরম ঘাসে মোড়া ঝিলের পাড়, দুটি ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করে পায়চারির রাস্তা ছেড়ে বোধ হয় জলের ধারে গিয়ে বসবে বলে এগোচ্ছে, তাদের সামনেই গাছের তলায় আরেকজন পুরুষ বসে আছে, একটি মেয়ে তার সামনে উপুড় হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছে, আরেকটি মেয়ে বসে। খানিক দূরে ঘাসের ওপর একা বসে একজন, পুরুষ না স্ত্রী বোঝা যাচ্ছে না। ঝিলের ধার ঘেঁষে পায়ে-চলার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জনকয়েক নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ। দূরে, ঝিলের ওপাড় দেখা যাচ্ছে, গাছপালায় নিবিড়, ঘন সবুজ।

এরকম ধরনের ছবি পত্র-পত্রিকায় আকছার দেখতে পাই, তবু একটু বিশেষভাবে তার কথা বলবার উদ্দেশ্য, সংস্কৃতির জন্যে কী মূল্য দাবি করা হচ্ছে, কী ত্যাগ করবার জন্যে কলকাতাবাসী প্রস্তুত বলে জানানো হচ্ছে, তার একটু

আভাসমাত্র দেওয়া। কিন্তু সংস্কৃতি-প্রেমের একটা ভোগের দিকও আছে। কিংবা বলতে পারি—উপভোগের দিক। যেমন, পারকের বিনিময়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। অর্থাৎ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা বাদ দিলে, প্রধানত সিনেমা-হল, থিয়েটার ইত্যাদি।

সারা ভারতের কথা অত সহজে বলা যায় না, কিন্তু পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে কলকাতার গুরুত্ব কে অস্বীকার করবে? (তাতে অবশ্য বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য বোঝায় না।) অথচ এই শহরে সিনেমা-হল এবং থিয়েটারের দৈন্য এত দিনে সারা ভারতে আলোচনার একটা বিষয় যদি হয়ে উঠে নাও থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। এই দৈন্য সংখ্যার হিসেবে যত না, গুণগত মানের দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি লজ্জাকর। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালকের নিজের শহরে আজ এমন সিনেমা-হল খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে, বিলাস-বৈভবের কথা দূরে যাক, দু-আড়াই ঘণ্টা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকার জন্যে আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের যে ন্যূনতম ব্যবস্থা থাকা দরকার সেটুকুও হলের মালিক করে রেখেছেন। কাজেই, এমন একটি শহরে যদি সুন্দর একটি নতুন প্রেক্ষাগৃহের জন্ম হয়, সে খবর আনন্দ-নাড়ু বিতরণ করার মতো। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যা নতুন তার দিকে শিশুসুলভ আগ্রহ যেমন দরকার, তেমনি যা নতুন না হলেও আদরণীয়, তার সম্পর্কেও বয়স্কসুলভ মমত্ববোধ যে-কোনো সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। বিবিধার্থসাধক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আগে আমাদের না থাকলেও, চিত্তবিনোদনের, কিংবা সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্যে শহরে আলাদা-আলাদা যেসব ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ নাট্যশালা, রঙ্গশালা, সভাগৃহ, গ্রন্থালয় সংগ্রহশালা ইত্যাদি, যদি আমাদেরই অবহেলায় এমন একটা দুরবস্থায় না পড়ত যে সেগুলোর পুনরুদ্ধারের কল্পনাই কারো মনে আসে না, তা হলে এমন পুরোনো পারক এবং পুকুরের জায়গায় নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলবার প্রস্তাব ওঠামাত্র ধিক্‌কৃত হত।

নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মানে, স্থূলভাবে দেখতে গেলে, সংগীত-নৃত্য-সিনেমা-নাটক—এইসবের জন্যে প্রেক্ষাগৃহ। তা ছাড়া সেখানে কখনও-কখনও কবিতাপাঠ কিংবা আবৃত্তি, সাহিত্য কিংবা সিনেমা বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদিরও আয়োজন হবে, আশা করা যায়। যে-কোনো উন্নত ধরনের সংস্কৃতিতেই এ-সব অপরিহার্য উপকরণ। সে কথা স্বীকার করবার পরেও এসব ধরনের অনুষ্ঠানের একটা দিক লক্ষ করবার থেকে যায়। এতে অল্প কয়েকজন কিছু একটা করেন, বাকি সকলের কাজ প্রধানত চুপ করে বসে দেখা এবং শোনা। নৃত্য-গীত ইত্যাদি যদি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ধূপ এবং রজনীগন্ধার প্রাচুর্য যদি রঙ্গমঞ্চে লক্ষ করা যায়, তা হলে দর্শক-শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় শুধুমাত্র ভক্তিবিহ্বল নিস্তব্ধতা।

পারফরমিং আর্টস যখন উচ্চতম শ্রেণীর আর্টের স্তরে ওঠে, অর্থাৎ, যেমন ধরা যাক, শ্রেষ্ঠ সংগীতরচয়িতার সৃষ্ট সংগীত যখন শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পীর কাছে আমরা শুনতে পাই, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে, মগ্ন হয়ে তা শুনবে, এইটেই প্রত্যাশিত, এর অন্যথা হলেই দুঃখের এবং লজ্জার কারণ ঘটে। রস যেমন নানা শ্রেণীর, নানা স্তরের, তেমনি তার উপভোগেও নানা ধরন আছে, মনের মধ্যে রসের যে ক্রিয়া তার প্রকাশও নানা রকমের। কখনো তা প্রাণচঞ্চল, কখনো সংহত গম্ভীর। সহজাত ক্ষমতা ছাড়াও শিক্ষা, অনুশীলন, সাধনার দ্বারা শিল্পীরা যখন সংগীত, নৃত্য, নাটকের অভিনয়কে শিল্পবস্তুতে কিংবা রসিকজনের উপ-ভোগের বস্তুতে পরিণত করেন, তখন দর্শক-শ্রোতার নিজের আসনে শান্ত হয়ে বসে তা উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে এইরকম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুগন্ধি ধূপ এবং রজনীগন্ধাও বেশ মানানসই।

কিন্তু 'আমার প্রভুর গৃহে অনেক মহল'।

বেশ কয়েক বছর আগে—"ওয়েসট সাইড স্টোরি" নামে একটি মারকিন ফিলম কলকাতায় এসেছিল। অতিশয় বিখ্যাত ছবি, একবার দেখলে সহজে ভুলবার মতো নয়। ছবির শুরুতেই দেখা যায় একদল তরুণ, কেউ খুব জোর কদমে হেঁটে, কেউ বা প্রায় ছুটে, রাস্তা দিয়ে চলেছে। তারপর দেখি, আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তাদের চলা কী সহজে, কেমন আপনা-আপনিই নৃত্যে রূপান্তরিত হল। প্রাণধারণের, দেহধারণের যে আনন্দ, কিংবা বলা উচিত প্রাণশক্তিতে ভরপুর যে দেহ, সেই দেহ ধারণের আনন্দ শুধু হেঁটে চলার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারল না, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, যৌবনদৃপ্ত নৃত্যের মধ্যে সে খুঁজে নিল তার চলার ছন্দ। চোখের সামনে দেখলাম, সাধারণ, দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে থেকে নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ কেমন করে উৎসারিত হয় নৃত্যের মধ্যে দিয়ে।

অবশ্য জানি, "ওয়েসট সাইড স্টোরি"-র ওই নিগ্রো

তরুণদের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিপুণ নৃত্যশিল্পী, তাঁদের যে নাচ দেখে মনে হচ্ছিল খুবই সহজ, তা অনেক যত্ন এবং সাধনার ফল। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারি, ঠিক এতখানি পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও, এইভাবেই, উৎসবের সময়, কিংবা আনন্দের কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে, সর্বসাধারণের মিলনস্থলে, পথে-ঘাটে সাধারণ লোকে আমোদ-আহ্লাদ করে থাকে। সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনের মস্ত বড়ো একটা অংশ জুড়ে থাকে এই ধরনের অনুষ্ঠান, যাতে দর্শক কেউ নেই, শ্রোতা নেই, কিংবা যদিও থাকে, তার জন্যে নয় এ অনুষ্ঠান, এ তারই যে গান গেয়ে ওঠে, নিজে ভালো গাইতে পারে বলে নয়, বাতাসে আনন্দের ঢেউ উঠেছে বলে, আর সকলের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়, আর সকলের মতো তারও আনন্দের স্বাভাবিক প্রকাশ নৃত্যে, সেইজন্যে। সকলকে ডাক দিয়ে বলা হয়, 'এভরিবডি সিং'। সে গান কাউকে শোনাবার নয়, আসনপিঁড়ি হয়ে কোলে হাত জড়ো করে বসে, সুবচনীর কথা শোনার মতো করে শুনবার নয় এবং এটাও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতির একটা দানই বটে, যদিও সুগন্ধি ধূপ এবং রজনীগন্ধা, এবং সব মিলিয়ে একটা উপাসনাগৃহের পরিবেশ, অর্থাৎ "সংস্কৃতি" শব্দটি ভক্তিবিজড়িত আবেগকল্পিত স্বরে উচ্চারণ করবার সময়ে যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। এবং এই যে আরেকটা দিক সংস্কৃতির, যে দিকটার কোনো ঠাঁই নেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে, সেখান থেকে আনন্দের একটা বড়ো যোগান আসে সমাজজীবনে।

সে যোগান আরও নানা দিক থেকে অবশ্যই আসে, সাহিত্য থেকে, শিল্প থেকে, এবং এমন নানা ধরনের সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে যার মধ্যে সম্মিলিত নৃত্য এবং সংগীতের কোনো উপলক্ষই ঘটে না। তা ছাড়া মানুষও নানা ধরনের থাকে, তাদের রুচি এবং চাহিদাও নানা রকমের। সকলের উৎসবও এক নয়, সকলের আনন্দও এক নয়। সুসভ্য, বিকশিত সমাজে সংস্কৃতির নানা স্তর থেকে উৎসবের, আনন্দের, অবকাশরঞ্জনের উপকরণের যোগান আসবে, নানারকম ভোজের আয়োজন থাকবে, যে যার রুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী, এই ভোজে, নয় ওই ভোজে, কিংবা আজ এই ভোজে, কাল ওই ভোজে পাতা পাড়বে। নানা জনের, নানা উপলক্ষের নানারকম চাহিদা যদি কোনও সংস্কৃতি মেটাতে না পারে, সেটা তার দৈন্য, তার অসম্পূর্ণতা। বুঝতে হবে, তার স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোনো কারণে কোথাও এসে আটকে গেছে। বাঙালির সংস্কৃতির বহুবিধ উৎকর্ষ যেমন গর্ব করার মতো, তেমনি সব মিলিয়ে দেখতে গেলে এটাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সে সংস্কৃতির মধ্যে কী যেন একটা কুণ্ঠা আছে, একটা জড়িমা আছে, যার ফলে সে জীবনধারণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আনন্দটাকে দেহের আধারে তুলে ধরতে অক্ষম।

এই অভাব যদি আমরা আদৌ বোধ না করতাম, সাংস্কৃতিক জীবনে এমন কোনো চরিতার্থতার যদি আমাদের প্রয়োজনই না থাকত যা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে লভ্য নয়, তা হলে আলাদা কথা ছিল। তা হলে বলতে পারতাম, আমাদের যা আছে, তাই আমাদের যথেষ্ট, তাতেই আমাদের ইষ্ট, আমাদের পরিপূর্ণতা, আমাদের তৃপ্তি। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে একবার ভালো করে তাকালেই বোঝা যায়, যে প্রয়োজন দেহধর্মেরই অন্তর্গত, আমরাও তার ঊর্ধ্বে নই। সুগন্ধি ধূপ এবং রজনীগন্ধা পরিবেশিত বৃত্তের বাইরে, আমাদের স্বীকৃত সাংস্কৃতিক জীবনের বাইরে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে তার পরিচয়।

প্রতিমাবিসর্জনের শোভাযাত্রায় যে নাচ দেখা যায়, পিকনিকের দলে সমবেত কণ্ঠে যে গান শোনা যায়, তার দিকে আমাদের সংস্কৃতি, কিংবা বলা ভালো সংস্কৃতি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, পিছন ফিরে থাকতে পারে, বেমালুম অস্বীকার করতে পারে তাকে, কিন্তু সেসবও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ। অথচ পিকনিকের গানের বেলা ততটা না হলেও বিসর্জনের নাচের বেলা ধিক্কার ছাড়া আর কিছু তার দিকে প্রসারিত হবে, সংস্কৃতিমান বাঙালির পক্ষে তা চিন্তা করাই অসম্ভব। তার একটাই কারণ এবং সেটা হচ্ছে, বাঙালির সংস্কৃতি-চিন্তা সুগন্ধি ধূপ এবং রজনীগন্ধার বৃত্তের মধ্যেই অতি সন্তর্পণে, পাছে পায়ের শব্দ হয়, ঘোরাফেরা করে। লোকনৃত্য, লোকসংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে যতটুকু আগ্রহ সংস্কৃতিমান বাঙালির মধ্যে কখনো-সখনো দেখা যায়, সেটা নৃতাত্ত্বিক আগ্রহ, পলিনেশিয়ার নৃত্যগীত সম্পর্কে মার্কিন নৃতত্ত্ববিদের আগ্রহের মতো তার সঙ্গে আমাদের মিউজিয়মের সম্পর্ক, বাস্তব জীবনের নয়। বাঙালির সংস্কৃতির ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত তার সঙ্গে কতটুকু মিশে আছে কোনো সবল, সতেজ প্রাণবান লোকসংস্কৃতিধারা?

মাস কয়েক আগে আমেরিকা থেকে একটি সংগীতশিল্পীর দল কলকাতায় এসেছিল। তাদের ব্যানজো, ম্যানডোলিন, বেহালা এবং গীটারের সম্মিলিত ধ্বনি শ্রোতাদের মধ্যে যে শিহরণ তুলেছিল, আজও সে কথা অনেকের মনে থাকতে পারে। সেই বাদকবৃন্দ, "দ্য নিউ গ্রাস বিভাইভাল" আমেরিকাতেও এমন ধরনের জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যার তুলনা পাওয়া কঠিন। অথচ ওদের সংগীত আমেরিকার এক সুদূর প্রান্তের একান্তভাবে স্থানীয় একটি লোকসংগীতের ধারা থেকে উদ্‌ভূত। এদের "গ্রাস" মানে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের কেনটাকি রাজ্যের বিখ্যাত নীল ঘাস। সেই নীল ঘাসের রাজ্য থেকে আহরণ করে, এবং তাকে নতুনভাবে নানা উপকরণে সমৃদ্ধ করে, যে ধ্বনি তাঁরা এখন বিশ্বময় শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার মাধুর্য, তার সতেজ অথচ কোমল সৌন্দর্য, যে-কোনো সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যবান করবার মতো।

অবশ্য আমাদের বাউলও তো লোকসংগীত, এবং আরো নানা লোকসংগীত আমাদের আছে। লোকসংগীত বলে পরিচিত এক ধরনের গান এখন জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো বিশেষ অঞ্চলের কোনো প্রাণবান সংস্কৃতির ধারার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। না তা লোকসংস্কৃতি থেকে কোনো প্রাণরস আহরণ করছে, না তা সঞ্জীবিত করছে কোনো লোকসংস্কৃতির ধারাকে।

আমাদের সংস্কৃতি যদি আমাদের মনের বস্তু হত, যদি আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সত্যিকারের পথ আমরা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে দেখতে পেতাম, তাহলে শুধু রবীন্দ্রসদনের সামনে লাইন দিয়ে কেনা টিকিটটাকেই সংস্কৃতির জগতে প্রবেশের একমাত্র ছাড়পত্র মনে করতে পারতাম না।

এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, আপামর জনসাধারণ, যতই তারা পঁচিশে বৈশাখ ভোর থেকে রবীন্দ্রসদনের চত্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকুক, যতই রঙ্গীন শিল্পকর্ম দেখবার জন্যে হাজারে-হাজারে হাজির হোক, ওই সংগীত এবং ওই শিল্পের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে এমন পরিপূর্ণতার আস্বাদ যার নাগাল পেতে পারে একমাত্র দেহমনসমন্বিত গোটা মানুষটা। যে জীবনে কেবল বসে গান শোনা এবং নাচ দেখাই আছে, যার আনন্দ-উৎসবে নৃত্যগীত কেবলমাত্র দেখবার এবং শুনবারই বস্তু, বলতেই হয়, সেই জীবনে সংস্কৃতির দ্বার আরও বড়ো করে খুলবার দরকার ছিল।

আসলে দেহ নিয়ে আমাদের বড়ো কুণ্ঠা বড়ো সংকোচ। আবার সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের যারপরনাই গর্ব। অতএব, যুক্তিটা কতকটা এইরকম দাঁড়ায়: দেহ বস্তুটি বড়ো নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন। সংস্কৃতি অতিশয় সূক্ষ্মজিনিস, অত্যন্ত উচ্চ তার প্রকৃতি। কাজেই দেহ থেকে, দেহের স্বভাব আর ধর্ম থেকে, তা যত দূরে থাকবে, ততই তার বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে।

মুখে আমরা যাই বলি, আসলে যা কোনো মানুষের বেলা সত্য নয়, তা আমাদের বেলাতেও সত্য হতে পারে না। যে সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে না, তা কখনও মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীণভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে না, সত্য হয়ে উঠতে পারে না।

যদি আমাদের জীবনে আমাদের সংস্কৃতি সত্য হয়ে উঠত, তাহলে বুঝতাম—ওই যে একটা অতিশয় আধুনিক শহরের কেন্দ্রস্থলে শান্ত গভীর একটা ঝিল, ওই যে তার সবুজ ঘাসে মোড়া পাড়ে কোথায় তিনজন কেউ শোয়া কেউ বসা অবস্থায় গল্প করছে, কোথাও একজন একা বসে আছে, ওই যে ঝিলের ওপাড়ে দেখা যাচ্ছে নিবিড় হয়ে আছে গাছপালা—এও সংস্কৃতিরই একটা বহুমূল্য দান।

নেতৃত্বের সংকট

আশরাফ শামীম

'জ্ঞান, নীতি এবং সত্য—এই হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম রক্ষক।'—প্লেটো যখন তাঁর "রিপাবলিক" গ্রন্থে সক্রেটিসকে দিয়ে এই কথাটি বলিয়েছিলেন তখন সক্রেটিসের সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হবার জন্য সেখানে কেবল অ্যাডিমেনটাসই উপস্থিত ছিলেন। অ্যাডিমেনটাস যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরই কথাটিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন ; স্বয়ং সক্রেটিস বলছেন বলে নয়।

প্রসঙ্গটি এজন্যেই তুলেছি যে, কোনো জননেতার ভেতর নেতৃসুলভ গুণাবলী, প্রতিভা, প্রজ্ঞা এবং আদর্শপরায়ণতার সমন্বয় ঘটেছে—সাধারণ নাগরিকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এমন ধারণা করাটাই স্বাভাবিক। নয়তো অসংখ্য মানুষ তাঁর কথায় সাড়া দেবে কেন? আন্দোলিত হবে কেন? প্রত্যেকেই হয়তো ধরে নেয় তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করেই তবে এসেছেন। যদি সাধারণ প্রস্তাবে এটি মেনে নেয়া যায়, তবেই প্রশ্ন আসে—বাংলাদেশে আজ যাঁদের নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়া হচ্ছে, বিশাল-বিশাল জনসমাবেশে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হচ্ছে, তাঁরা কি নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন?

প্রশ্নটির উপযোগিতা বর্তমান সময়ে যতখানি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, অতীতে তেমনটি হয় নি, এবং আজ যতখানি হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হবে, সে চিহ্ন স্পষ্টতর। সমাজের সচেতন অংশ থেকে আজ যে সমস্যাটির কথা বলা হচ্ছে তা হল এই নেতৃত্বের সমস্যা। জনসাধারণের মধ্যে প্রায় প্রতিটি লোকই আজ একদিকে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্তনাদ করে নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন পথের দিশা খুঁজে পেতে চাইছে, অন্যদিকে তারা বিরোধী-দলীয় কোনো-না-কোনো নেতৃত্ব-ব্যক্তিত্বকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলেছে। যে বিকল্প জনগণ বেছে নিচ্ছে তার ভালো-মন্দ সম্পর্কে তেমন কিছু তারা বোঝে না, এমনকি ভাবতেও চাইছে না।

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কার্যক্রমের মধ্যে এই যে বিস্তর ব্যবধান, এর প্রকৃত কারণ কী? আমরা আজ কোন্ ঐতিহাসিক পর্যায়কালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি? যে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবকাঠামোর ক্রমশ-ভেঙে গড়া অবস্থার কথা বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সমস্বরে চিৎকার করে বলা হয়ে থাকে, তারই বা প্রকৃতি কী? সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কী ধরণের ভূমিকা থাকা দরকার?—এই যে বিবিধ প্রশ্ন, আমরা দেখেছি বাংলাদেশে এমন কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা এগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন, বুঝতে চান, উত্তর খোঁজেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁদের বক্তব্যের প্রচার নিতান্ত নগণ্য বলে এবং তাঁদের কোন দলীয় ভূমিকা নেই বলে সমাজের দর্পণে এর কোনো প্রতিচ্ছবিই তৈরি হতে পারে না। অথচ একটি জাতির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে, একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষের জীবনকে আরো মানবীয় করে তোলার জন্য মানবসমাজের যে চিরন্তন চেষ্টা—এইসব প্রশ্ন সে চেষ্টারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রথমেই আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি সেটি হল 'জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ব্যবধান রচিত হবার কারণ কী?'

বাংলাদেশ থেকে

আমার ধারণা, এটি আলোচনার আগে আমাদের বোঝা প্রয়োজন 'জনগণের আকাঙ্ক্ষা' জিনিসটি কী।

দেখা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে যতগুলো সরকার ক্ষমতায় বসেছে তাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ক্ষমতাগ্রহণকে সিদ্ধ করার জন্য তাদের দুটো প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা সদম্ভে ঘোষণা করেছে। এর একটি হল 'জনগণ', এবং অন্যটি 'আল্লাহ্ :—'দেশের এই চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে শেষ ভরসা হিসেবে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার জন্যই আমরা ক্ষমতাগ্রহণে বাধ্য হয়েছি ;' কিংবা 'পরম করুণাময় আল্লাহ তালাহ আমাকে এদেশের জনগণের খেদমতের জন্য রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেছেন।' এই দুটি বুলিতে যে 'জনগণের' কথা বলা হয়েছে, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই জনগণ দেশের অগণিত লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু জনগণ নয়। শাসকগণ যে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছে সেই শ্রেণী বা গোষ্ঠীকেই তারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'জনগণ' নামে আখ্যায়িত করেছে। তাই "শাসকগোষ্ঠীর জনগণের আকাঙ্ক্ষা" ও "প্রকৃত জনগণের আকাঙ্ক্ষা" কখনো এক হয় নি। ফলে যখন যে গোষ্ঠীই ক্ষমতায় এসেছে সে গোষ্ঠীর লোকজনদেরই কেবল উদরপূর্তি ঘটেছে, আর সাধারণ মানুষের সার্বিক দুর্দশা আর অনিশ্চয়তা দিন-দিন হয়েছে আরো ঘনীভূত।

সুতরাং, এদেশের খেটেখাওয়া কোটি-কোটি মানুষের যে আর্তনাদ, যে আকাঙ্ক্ষা তা হল সবরকমের শোষণ আর বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা, মহৎ নেতৃত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা, সমাজ-পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। অথচ দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত অবহেলায় জনগণ তাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক এবং সামাজিক দায়িত্বটুকু এবং আচরণটুকু পালন করতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় : সামাজিক বিকাশের দিক দিয়ে আমরা কি তবে এমন কোনো ঐতিহাসিক পর্যায়কালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি যেখানে সবকিছুই যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে? এখানে যার চলার কথা সেই স্থির, আর যার চলার কথা নয় সেই চলমান। প্রতিটি বস্তুই যেন একই সঙ্গে একাধারে দুটি শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে। প্রতিটি মানুষের আচরণেই লেপটে আছে বিবেকবর্জিত অসহনীয় দ্বৈততা। এরা যা আশা করছে, প্রায় তৎক্ষণাৎ আরেকটি বিপরীতমুখী প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই আশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়ে পড়ছে। এই যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাটি, একেই বলা হয়েছে যুগসংক্রান্তি। আবুল কাসেম ফজলুল হক "যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা" গ্রন্থে জানাচ্ছেন—'সামন্তযুগের পুরাতন আদর্শ, নীতি, আইন ও দৃষ্টিভঙ্গি—সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে ; কিন্তু উন্নততর নতুন আদর্শ, নীতি, আইন ও দৃষ্টিভঙ্গি—সেইসঙ্গে উন্নততর নতুন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠনি—এমনি এক শূন্যতার অবস্থা সেই যুগসংক্রান্তি।' আমাদের দেশের বর্তমান যুগসংক্রান্তির শুরু থেকে আজ অবধি যে ব্যাপ্তি তা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের পরিবর্তনগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কিভাবে ওই অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে উন্নততর নতুন যুগের সূচনা করা যায় সে বিষয়ে তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণাবোধকে মূর্ত করে তুলেছেন 'যুগসংক্রান্তি আর নীতিজিজ্ঞাসা" গ্রন্থে। তিনি এটি নিবেদন করেছেন সেইসব তরুণের উদ্দেশ্যে 'যাদের বয়স আঠারো থেকে আটাশ, যারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, তর্ক করতে চায়, নিকৃষ্ট উপলব্ধি ত্যাগ করে উৎকৃষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে চায় এবং অতীতের গর্ত থেকে বর্তমানকে মুক্ত করে অন্যায়মুক্ত অভাবমুক্ত সমৃদ্ধ আনন্দময় নতুন স্বদেশ ও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়।'

শুধু জ্ঞানগতভাবে নয়, আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব দিয়েও আমরা জেনেছি যে সত্যিসত্যিই ইতিহাসের এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে আজকের বাংলাদেশের সমাজ নিপতিত যেখানে 'পুরাতন' মূল্য হারাতে থাকে কিন্তু 'নতুন'ও গড়ে ওঠেনা, উন্নত সমাজ গড়ে উঠতে পারে না—এ এক ভয়াবহ শূন্যতার অবস্থা। যেকোন অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় এই শূন্যতার ভেতর যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠবে, এটা নিশ্চিত।

যে-কোনো সমাজের গঠনপ্রকৃতি মূলত নির্ধারিত হয়ে থাকে সেই সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার দ্বারা। সে বিচারে অনুন্নত ধনতান্ত্রিক-সমাজ-ব্যবস্থাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকমাত্রেই জানেন, কী ভয়ানক রকম ফাঁপা আর শেকড়হীন এই আর্থব্যবস্থা। হাজার-হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণভারে জর্জরিত, কৃষি-শিল্প-প্রযুক্তিক্ষেত্রে নিদারুণ অসহায় অবস্থা—অনেকটা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনত দশা, দুর্নীতির বিষাক্ত থাবায় ক্ষতবিক্ষত প্রতিটি ক্ষেত্র, শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক ধারার কেরানি আর বেকার সৃষ্টির সেই বিশুদ্ধ ছাঁচ, স্বাস্থ্যব্যবস্থার অমানবিক সংস্থান, ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হার, ব্যাবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া লুটপাট নীতি, কালোবাজারি-চোরাচালানি আর মজুতদারির জয়জয়কার—মোটামুটিভাবে এইসব উপাচারগুলির একটা সুসংবদ্ধ গাঠনিক ভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজকাঠামোটি।

আজ এমনই এক দুঃসময় যখন বাংলাদেশের কোথাও জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তাটুকু পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এখানে রাজনীতি পরিচালিত হয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর জাগ্রত শক্তিকে, সৃজনী শক্তিকে সম্বল করে নয় ; শাসক-শোষক-বর্গের প্রতি জনগণের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে সম্বল করে। ফলে, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়ার নাম রাজনীতি, তা পর্যবসিত হয় দল বা গোষ্ঠীর হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার, সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের এবং অবৈধ সম্পদের ভাণ্ডার গড়ে তোলার অনায়াসলব্ধ কৌশলে। এদেশের 'মার্কসবাদী-

'ধনতন্ত্রী'-নির্বিশেষে প্রতিটি মহলেই ধোঁকাবাজি, গলাবাজি, কূপমণ্ডূকতা, হঠকারিতা, ষড়যন্ত্র, আত্মকলহ-পরায়ণতা, অবিমৃষ্যকারিতা এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের যেন এক তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। জনগণের হাতে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য হলেও জনগণের নামে এইসব দল-গুলো নিজ-নিজ স্বার্থ-গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সবরকম হীন পন্থা অবলম্বন করতেও কার্পণ্য করছে না। মূলত এইসব অসৎ রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের ব্যর্থতাই বারবার সামরিক শাসন ডেকে আনছে।

উপরিকাঠামো অর্থাৎ সংস্কৃতিতেও তাই অনিবার্যভাবে পড়েছে এই শূন্যতার প্রভাব। বঞ্চনা থেকে হতাশা, আর হতাশা থেকে জন্ম নিচ্ছে অসাধু প্রবণতা ; সবশেষে তা রূপ নিচ্ছে জিঘাংসাবৃত্তিতে। সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, চলচ্চিত্র, সংগীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি মাধ্যমগুলোর সাথে যেসব বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক জড়িত তাঁদের অধিকাংশের আত্মবিক্রীত চেহারাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশিত নয় বলে প্রগতির আড়ালে প্রতি-ক্রিয়ার ছোবল হানতে তাঁদেরকে খুব বেশি ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানে থেকে জেনে-শুনে নির্দ্বিধায় এমন সব কাজে তাঁরা লিপ্ত যা শুধুমাত্র প্রগতিবিরুদ্ধই নয়, কখনো সেসব হয়ে পড়ে রীতিমতো ঘৃণ্য অপরাধ।

এতক্ষণ সমাজের যে সামগ্রিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম এটি এতই সংক্ষিপ্ত এবং অনুজ্জ্বল যে তাতে আগ্রহী পাঠকের পিপাসা নিবৃত্ত হবার নয় ; তবে সম্ভবত বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের ভাঙনটি বোঝার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব হল জনগণকে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ভাঙা-গড়া, পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন আর সতর্ক রাখা, কিন্তু এদেশের বিরোধী-দলীয় রাজনীতিকরা তাঁদের সুবিধামতো কখনো-কখনো সমাজের অধঃপতন সম্পর্কে হা-হুতাশ করলেও প্রকৃত অবস্থাটি প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা ততটুকুই সাবধানী যতটুকু বললে সরকারও তেমন গোস্বা হয়না আবার জনগণকেও কোনোমতে বুঝ দেয়া সম্ভব হয়।

তাহলে এবারে যে গুরুতর প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা হল—যুগসংক্রান্তির এই অপচ্ছায়া দীর্ঘকাল ধরে আমাদেরকে একইভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে পারছে কেমন করে ? কেন ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া ? আসলে মূল সমস্যাটি কোথায় ?

নিজেদের "মার্কসবাদী" বলে দাবি করে থাকে এমন একদল লোক রয়েছে যারা এ প্রশ্নের একটি ত্বরিত জবাব সব সময়ই তৈরি করে রাখে। তারা জবাব দেয়, 'ঘতোদিন না এদেশের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হবে ততদিন পর্যন্ত এমন সংকট চলবেই। কাঠামোটাই মূল। আগে এটি পালটাতে হবে।'

জ্ঞান বা চিন্তার যদি একটি খোদাইকরা গাণিতিক নিয়ম থেকে থাকে, অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে যদি জ্ঞানকে লক্ষ্যের বিপরীতে বিকাশহীন স্থিরতায় সংস্থাপিত করা হয়, তবে সত্যিই আমাদেরকে আজীবন 'কাঠামো' আর 'বিপ্লব'-এর তাৎপর্যবিহীন খেদোক্তির ভেতরেই হয়তো বসবাস করে যেতে হবে। কিন্তু যদি আমরা পৃথিবীতে মানুষের জ্ঞান এবং চিন্তার ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করি তাহলেই আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব। পৃথিবীর মানুষ তারই বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে তার ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে, চেতনাকে, বুদ্ধিকে, চিন্তাকে জাগ্রত করে তুলেছিল। একেকটি আবিষ্কার, একেকটি উপলব্ধি তাকে আরো নতুন-নতুন আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণকারী চিন্তার নতুন-নতুন ধারা ; জ্ঞানের নিত্য-নতুন শাখা-প্রশাখা।

মানুষের ভেতর লুকিয়ে আছে এমন শক্তি যার দ্বারা সে পরিবেশের প্রভুও হয়ে উঠতে পারে। এক অবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সৃষ্টি করতে পারে কালোপযোগী নতুন অবস্থা। পারে উন্নততর নতুন সমাজ ও নতুন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে।

কিন্তু মানুষের দ্বারা এর উলটোটাও ঘটা সম্ভব। মানুষ মানুষের প্রতি অমানবিক এবং কদর্য আচরণ করছে, ভালোবাসার জায়গায়, মিলনের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে ঘৃণা আর সংঘাত ; প্রকৃতি নয়, নিয়তি নয়, এবার সে নিজেই নিজের সম্প্রদায়ের ওপর প্রভুত্ব করতে চাইছে—এমন দৃশ্যও সমাজে অতি সুলভ। হিটলার-মুসোলিনি-চেঙ্গিস-হালাকু মানুষের এই প্রবৃত্তিরই বড়ো দৃষ্টান্ত।

দেখা যাচ্ছে, একই মানুষের ভেতর একদিকে যেমন রয়েছে প্রেম, শ্রদ্ধা, স্নেহ, সমবেদনা, সৌন্দর্যবোধ, ক্ষমা, ঔচিত্যবোধ, ইত্যাদি মানবিক প্রবৃত্তি তেমনি অন্যদিকে ঘৃণা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা ইত্যাদি পাশবিক প্রবৃত্তি-গুলোও পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই দুটি বিরোধী প্রবণতা সবসময়ই মানুষের অস্তিত্বে একে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল থাকে। ভালো জীবন যাপনের জন্য যা দরকার তা হল ব্যক্তি- এবং সমাজ-জীবন থেকে পাশবিক প্রবণতাসমূহকে দমন করে মানবিক প্রবণতাসমূহকে বিকশিত করে তোলা। যেহেতু একইসঙ্গে মানুষ একান্তই ব্যক্তিক এবং সামাজিক এই উভয়বিধ সত্তার অধিকারী, সেহেতু ব্যক্তির কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত পাশব অথবা মানব প্রবৃত্তিগুলোই সমাজের ভেতর অনু-প্রবিষ্ট হয়। ফলে একটি সমাজের উত্থান-পতনের জন্য সেই সমাজস্থিত মানুষের সামাজিক সদাচরণ কিংবা অসদা-চারণের মধ্যে অন্তত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ, সরলীকরণ করা হলে সম্পর্কটি এই দাঁড়ায় যে, যখনই আমাদের কোনো নতুন সুন্দর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তখনই প্রয়োজন হয় মহৎ আবেগের ; আর আবেগকে মহৎ হতে হলে প্রয়োজন হয় যুক্তির লৌহকঠিন বেষ্টনী।

মানবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে পরিচয় করিয়ে দেয়া নিজেদের 'মার্কসবাদী' বলে দাবিকারী বন্ধুদের প্রদত্ত জবাবটির প্রসঙ্গে আসতে পারি। তারা বলেছে, মূল কাঠামোটিকেই সর্বাগ্রে পরিবর্তন করলে সমাজের সকল সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই ঘটে যাবে। সামাজিক পরিবর্তন সাধনের বৈপ্লবিক সূত্র হিসেবে একথার গুরুত্ব যে আমাদের 'মার্কস-বাদী' বন্ধুদের কাছে অপরিসীম, তার জন্য আমরা আনন্দ অনুভব করি। কিন্তু যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়—সমাজের যে মূল কাঠামোটি পরিবর্তন করলে যুগসংক্রান্তির অবসান ঘটিয়ে উন্নততর নতুন সমাজবিনির্মাণ সম্ভব সেটি ঘটাবে কারা, কেন ঘটাবে এবং কোন্ অবস্থায় তারা সেটি ঘটাতে সক্ষম—তবেই যেন আমাদের 'মার্কসবাদী' বন্ধুদের হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। নানান তত্ত্বের কচকচানির মধ্যে কিছু দুর্বোধ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে তারা বোঝাতে চায় প্রকৃত-পক্ষে এমন কাঠখোট্টা প্রশ্ন করাটাই ভীষণ মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। অপরদিকে আমাদের বিবেচনায়, আজকের সময়টাতে সর্বাগ্রে আমাদের এইসব প্রশ্নেরই সম্মুখীন হওয়া দরকার। আমাদের বলা দরকার, যারা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চায় তারা অবশ্যই মানুষ—পশু নয়। তারা এটি অবশ্যই ঘটাবে কারণ তাদের মধ্যে কাজ করবে একটি মহৎ আবেগ আর সেই আবেগের পেছনে ক্রিয়াশীল যুক্তিটি হল—উপোপাতিত হওয়া উচিত বর্তমানের এমনসব সম্পর্ক যেখানে মানুষ পরিণত হয়ে আছে মানুষের দাসে, অধিকারহীন ঘৃণিত জীবে। একমাত্র তখনই এই পরিবর্তনের কথা কল্পনা করা যায় যখন পরিবর্তনকামী মানুষরা নিজেদের মধ্যে মানবিক আচার-আচরণে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য দেবে এবং পাশবিকতাকে সযত্নে পরিহারের ব্যাপারে নৈতিক অনুশীলনে সচেষ্ট হবে।

অথচ আমাদের উল্লিখিত 'মার্কসবাদী' বন্ধুরা যেন ধারণায়ই আনতে পারে না যে, তারা মানুষ ; বোধহীন যন্ত্র নয়। তাদের নিজেদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ভেতরেও যে ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সুন্দর-অসুন্দর, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব সতত ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেটি যেন তারা বোঝেই না। সুযোগ পেলে তারাও যে লোভী হয়ে উঠতে পারে, প্রতারক আর সুবিধাবাদী হয়ে উঠতে পারে—সম্ভবত তারা প্রতিজ্ঞা করেছে এটি তারা কিছুতেই বুঝবে না। বুঝবে না, কারণ এর পেছনে কাজ করছে তাদের নিছক অজ্ঞতা এবং মোল্লাতান্ত্রিক মনোভাব। মানুষের মনোজগতে যদি উন্নত চিন্তা, উন্নত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত না করা যায় তবে সেসব মানুষদের দ্বারা উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে, একথা কি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে ? অন্তত বিগত ছয় দশক ধরে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের জন্য যতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার ফলাফল থেকেই এ প্রশ্ন উত্থাপনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যেতে পারে। আমাদের বোঝা প্রয়োজন, কোন্‌সব জিনিস মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওকে অসাধারণ মানুষে রূপান্তরিত করেছিল। মানবসমাজের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, যুক্তিবোধ, সত্যের প্রতি অবিচল দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবোধ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞানের সম্ভাবনার প্রতি গভীর আস্থা—এইসব মানবীয় গুণাবলীর অবিরাম এবং কঠোর অনুশীলন নয়কি ? তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যেই কি উদ্ভাসিত হয়ে রয় নি এইসব মানবীয় গুণাবলীর আশ্চর্য চিহ্ন ?

আসলে, যুগসংক্রান্তিকবলিত সমাজের পরিবর্তন চাইলে একই সাথে সমাজস্থিত মানুষের মনোজগতেও পরিবর্তন একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। একটি ভূখণ্ডের সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন কোনো মহৎ আবেগের দ্বারা আন্দোলিত হয়, কেবল তখনি পরিবর্তন সাধনের পথ সুপ্রশস্ত হয়। শুধু সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় নয়, রেনেসাঁস এবং ফরাসি

বিপ্লবের পেছনেও কাজ করেছে এই একই ব্যাপারটি। বলা যায়, মাত্র কয়েকজন উন্নত চিন্তার অধিকারী মানুষের কয়েকটি গ্রন্থই এই বিরাট মানবিক চেতনাকে আশ্চর্যজনকভাবে জাগিয়ে তুলেছিল; মানুষের ওপর মানুষ-কর্তৃক আরোপিত সকল বন্ধন ছিন্ন করে মানুষকে প্রচণ্ড গতিতে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়েছিল। তাঁরা নিজেরা জেগেছিলেন এবং জাগিয়েছিলেন সারা পৃথিবীকেও।

আমরা এতক্ষণ যে চিন্তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি তার সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়: নৈতিক-অনুশীলন-বিহীন ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সমাজের তো নয়ই, কোনো ব্যক্তির পক্ষেও উন্নত জীবন নির্মাণ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রী এবং মার্কসবাদী কখনোই এই নৈতিক প্রশ্নে মনোযোগী নন। তাঁরা প্রায়ই প্রথাগত যে ধর্মীয় নৈতিকতা, সদুপদেশ—তার সাথে নীতিবিজ্ঞানের আলোচিত নৈতিকতাকে গুলিয়ে ফেলে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। 'নৈতিকতা' শব্দটিকে যদি অতি সংক্ষেপে নির্দেশ করতে হয় তবে বলা যায় এটি হল 'অনাচ্ছন্ন ধর্মভাবমুক্ত যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা।' একটি দীর্ঘ যৌক্তিক বিচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সুন্দর ও সত্যকে আবিষ্কার করার প্রক্রিয়ার নামই নৈতিকতা, যার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা "বিবেক যুক্তি ও প্রগতি" প্রবন্ধে আবুল কাসেম ফজলুল হক অত্যন্ত সহজভাবে দিতে পেরেছেন।

বর্তমান আলোচনায় আমাদের সর্বশেষ প্রশ্নটি হল সমস্যা উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী হওয়া দরকার? বাংলাদেশের বিগত ছোটো-বড়ো গণ-আন্দোলনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নেতৃত্বের ত্রুটির কারণেই বারবার এই আন্দোলনগুলো লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। কখনো কয়েকটি আন্দোলন সাময়িকভাবে সফল হলেও সফলতাকে দীর্ঘকাল ধরে রাখা যায় নি। অথচ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইতিমধ্যেই জনগণকে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও নির্যাতন নিপীড়ন স্বীকার করে নিতে হয়েছে; শেষ বিচারে যার পুরোটাই ব্যর্থ হয়ে পড়ল। যদি মানুষের আত্মশক্তির ওপর আস্থা থাকে, গণতন্ত্র ও উন্নত গণতান্ত্রিক শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য থাকে আপোসহীন লড়াকু মনোভাব, তাহলে বাংলাদেশের সকল গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও সমাজশক্তিগুলোকে নতুন করে সুদৃঢ় গণ-আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করার পাশাপাশি যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির কাজটিকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। নতুন, বলিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত নেতৃত্বের একটি জাল যদি জনগণকে আবৃত না করে থাকে তবে আন্দোলন আগের মতোই বিপথগামী হতে বাধ্য। ক্যাডারভিত্তিক শক্তিশালী ও সুসংগঠিত পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বাম-প্রগতিশীল বলে পরিচিত সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এবং আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সংগঠনের ভেতরে সকল কাজের মুহূর্তে নৈতিক অনুশীলনকে সচেতনভাবে কার্যকর রাখা গেলেই কাঙ্ক্ষিত বিকল্প নেতৃত্ব তথা সৎ, নিষ্ঠাবান, আন্দোলন-সংগ্রামে আপোসহীন ও প্রতিভাবান মনীষার অভ্যুদয়ের পথ সুপ্রশস্ত হবে।

পরিশেষে বঙ্কিমের ভাষায় বলি: 'চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ: চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্ম নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাহার আর কোন ধর্মেরই প্রয়োজন নাই।'

মোহিতলাল ও বিভূতিভূষণ

শঙ্কর ভট্টাচার্য

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) বাঙলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক বলে পরিচিত, এবং মোহিতলাল মজুমদারকে আমরা জানি রবীন্দ্রযুগের এক কবি, প্রাবন্ধিক এবং শ্রেষ্ঠ সমালোচকরূপে। বিভিতিভূষণ এবং মোহিতলাল (১৮৮৬-১৯৫২)—এই দুই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্র আলাদা হলেও এক বিশেষ জায়গায় তাঁদের মিল ছিল অসামান্য। তৎকালীন বাঙালির সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং দুর্দশায় তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাশিতম জন্মদিন উপলক্ষে মোহিতলাল মজুমদারের বক্তৃতার কিছু অংশ বিশেষভাবে স্মর্তব্য। মোহিতলাল তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—'বাংলাদেশে আজ আর কোথাও কোনো স্তম্ভ নাই, কোনো আলোক নাই; এ যুগের বাঙালীর মত এমন আত্মপ্রবঞ্চিত, আত্মঘাতী, বুদ্ধিহত নির্বীর্য্য জাতি আর নাই। জীবনের কোন ক্ষেত্রে নূতন কিছু অর্জন করিবার যোগ্যতা তাহার নাই, পৈতৃক যাহা কিছু ছিল এতদিন তাহারই অপচয় করিয়া সেই পিতৃগণকে সে পরিহাস করিয়াছে। যে সর্বনাশের সে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে, সেই সর্বনাশ আজ যখন কালান্তক মূর্তিতে একেবারে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত, তখনও তাহার ধর্মবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি নাই; সৃষ্টির পরিবর্তে অনাসৃষ্টি, জীবনের পরিবর্তে মৃত্যু, ত্যাগের পরিবর্তে অতি নীচ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—শবলুব্ধ গৃধ্রদের উর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। জাতির শিক্ষাকে পর্যন্ত যাহারা কলুষিত করিয়াছে, সেখানেও আত্মপ্রাধান্যের কুটনীতিই যাহাদের একমাত্র সাধনীয়, যাহাদের কু-বিধি ও কু-অভিসন্ধির ফলে গত দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙালী সন্তান মূর্খতা ও বিদ্যাবত্তার প্রভেদ ভুলিয়াছে, এবং যাহার পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের আজ মৃত্যুদশা উপস্থিত, তাহারাও রাষ্ট্রঘটিত দুর্যোগের সুযোগ বুঝিয়া জাতির পবিত্রতা সাজিতেছে! যাহাদের জীবনে ও চরিত্রে সত্য, ধৃতি, ক্ষমা বা অলোভ ইহার কোনটাই নাই, তাহারাই যখন সমাজের নেতৃত্ব দাবি করিতেছে, এবং সে দাবিও গ্রাহ্য হইতেছে, তখন এ সমাজ আর বাঁচিবে কয়দিন?.....'*

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশবিভাগের সময় বাঙালি জাতি যখন চরম দুর্দশায় কবলিত সেই সময় মোহিতলালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যোগাযোগ হয়। মোহিতলালের তখন ভারতচেতনা বা বিশ্বচেতনা নয়, একমাত্র চেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গচেতনা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যক্ষেত্র বাঙলা এবং বাঙালির জীবন হলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বহির্বঙ্গ। বহির্বঙ্গের বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিরাট কর্মযজ্ঞে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বাঙালির প্রতি সরকারি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে সারা বিহারের বাঙালিকে একসূত্রে গাঁথবার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। বিহার বাঙালি সমিতি গঠন করা হল। বিহারের তিরিশ লক্ষ বাঙালির মুখের ভাষা রক্ষার জন্য ব্রত গ্রহণ করলেন বিভূতিভূষণ। পরবর্তী কালে

পত্রাবলী

বিহার বাঙলা আকাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে বাঙালির সাহিত্যসংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের কাজে নতুন-নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

বিভূতিভূষণকে মোহিতলাল যে পত্রগুলি লিখেছেন তার ষোলোটি সংগ্রহ করতে পেরেছি। পত্রগুলি ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে লেখা। ওই সময় মোহিতলালের শরীর মন ভাঙতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে দেশ-জাতির অবক্ষয় তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মানুষের মূল্যবোধ যখন শেষ হতে চলেছে তখন নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি বিভূতিভূষণের মধ্যে এক পরম আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রত্যেক পত্রে বিভূতিভূষণের সাক্ষাতের জন্য তিনি যেন আকুল হয়ে থাকতেন। মোহিতলালের পত্রাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে তিনি একটা বলিষ্ঠ নীতিকে সর্বদা আশ্রয়

* ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮ হাওড়া-সঙ্ঘ পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত, রবীন্দ্রজন্ম উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। পরে শনিবারের চিঠিতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮-এ "রবীন্দ্র-জন্মদিন" শীর্ষক নামে প্রকাশিত।

করে চলতেন। মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন, 'খুব সম্ভবত প্রথম পরিচয় শনিবারের চিঠির অফিসে হয়ে থাকবে। ওঁকে তো পুরো-পুরি জানতুমই। রবীন্দ্রযুগেও ওঁর কাব্যের বলিষ্ঠ স্বকীয়তার জন্যে। তারপর শনিবারের চিঠির অফিসেই ওঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে বলে মনে পড়ছে। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার মধ্যে আমার দ্বিতীয় প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্সের শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের স্থান খুব বেশী। উনি মোহিতবাবুর ছাত্র এবং প্রকাশকও ছিলেন। একসময় মোহিতবাবু বেশী রকম অসুস্থ হয়ে কিছুদিন তাঁর অন্য এক শিষ্যর বাড়িতে কাটান। সুরেশবাবুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে আমি মোহিত-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেখানে একটি বেশ বড় পুষ্করিণীর ওপারে একটি দ্বিতল বাড়িতে মোহিতবাবু সপরিবারে রয়েছেন। তাঁর বসার ঘরটিতে কাঠের তাকে অনেকগুলি নানা সাইজের বই। মোহিতবাবু তাঁর সৃষ্টির জন্য পূর্বেই আমাকে মুগ্ধ তো করেছিলেনই, সেদিন সেই রুগ্ন অবস্থাতে তাঁর সাহিত্যপ্রেম আর মনোবল দেখে আমি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। র‍্যাকের বইগুলি দেখিয়ে উনি বললেন, "আমি বড়-বড় লেখককে ক্লাসিক ধরেছি বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সম্বন্ধে এবার দীর্ঘ সমালোচনায় হাত দেব। কিছু কিছু দিয়েছি।"

'শরীর-মনের সেই অবস্থায় কোন লোক যে এরূকম বিপুলাকার কাজের সঙ্কল্প রাখতে পারে, আমাকে খুব চমকিত করেছিল।'

'শনিবারের চিঠিতে তিনি পূর্ব থেকেই এই কাজে হাত দিয়েছিলেন কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে তাঁর সমালোচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে একটা যে বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়ে পড়ে, এটা সাহিত্য-অনুরাগী মাত্রই জানেন। এরপর তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় তাঁর বড়িশায় থাকাকালীন। কলকাতায় গেলে শিবপুর থেকে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তাঁর ওখানে আমার যেতেই হত নিজের অন্তরের তাগিদে। কোনবার অপারগ হলে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন। একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যার জন্যে অনেকের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ ভেঙে-ভেঙে যায়। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন একটা স্নেহ ছিল এবং আমার দিক থেকেও তাঁর সৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ মতামতের জন্য এমন একটা শ্রদ্ধা ছিল যে আমাদের সম্বন্ধটা বরাবর অটুট থেকে যায়।

'এই সময় বড়িশাতে থাকতে তাঁর বঙ্গদর্শন তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয় এবং আমার কয়েকটি লেখা উনি চেয়েছিলেন। কোন্‌গুলি এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আরেকটা বিষয় এই তাঁর মতামতের সঙ্গে আমার মনের সমতা আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। সেটা এইখানে সবিস্তারে আলোচনা করবার ঠিক অবসর ও স্থান নয়। এইটুকুই বলতে পারি তৎকালীন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক এবং তজ্জনিত সামাজিক অবস্থা আমার মতনই তাঁর গভীর বেদনার বিষয় ছিল। স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির দান এবং ভারতের নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বাঙালির দান সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ ছিল না। অন্যান্য স্বদেশীয়দের অবহেলা, অনেক ক্ষেত্রে বৈরীভাব আমাদের উভয়কেই ক্ষুব্ধ করত। এ বিষয়ে আলোচনা উঠলে তাঁর ভাষা এত উগ্র হয়ে উঠত যে নিজের অভিমত মনের মধ্যে চেপে তাঁকে শান্ত করতে হত। প্রায় বলে উঠতেন, বিভূতিবাবু, আমার ব্লাডপ্রেসার আছে। বাধা দিয়ে আমায় চটাবেন না।'

বিভূতিভূষণকে লেখা মোহিতলালের পত্রাবলী—

১

বঙ্গদর্শন
সম্পাদক
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা
১৭।১২।৪২

প্রীতিভাজনেষু,

এইমাত্র আপনার কার্ড পেয়ে সুখী হলাম। আপনি আসছেন শুনে আরও সুখী হলাম। এবার যেন দেখা পাই।

আশা করি, কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানবেন।

ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কাঁঠালবাড়ি
পোঃ—দ্বারভাঙ্গা
বিহার।

২

ঢাকা
২৮।৪।৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পাইয়াছি। শ্রীমান সুরেশ একখানি

বরষাত্রী যথাসময়েই পাঠাইয়াছিলেন—আপনার উপহার সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

বইখানির ছাপা ও বহিরঙ্গশোভা এই অকাল ও দুষ্প্রাপ্যতার দিনে প্রশংসনীয়। কেবল ঐ ছবিগুলাই রসাভাস ঘটাইয়াছে অতিরিক্ত ব্যবসার বৃদ্ধির জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে; ছবিগুলিতে যে হাস্যরস চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাকে 'ভাঁড়ামি' বলা যায়—হিউমার নয়। বরষাত্রীদের মুখসাদৃশ্য ত' দূরের কথা—বয়সও রক্ষিত হয় নাই।

উৎসর্গপত্রে আপনি আমাকে যে দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলা শোভন হইবে না—কোন বিশেষণ না দিলেই ভাল হইত। এককালে কবিতা লিখিয়াছিলাম, সে কবিতার মূল্য যাই হোক—'সুকবি' বলিয়া তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন ছিল না। 'কবি' নাম আমার প্রাপ্য না হউক আমি 'সুকবি' হইবার লোভ কোনকালেই করি নাই। এই নামটির প্রতি আমার চিরদিনই একটা ঘৃণা আছে। 'সুকবি' বলিতে এক শ্রেণীর কবি বুঝায়—'ভাল কবি' বুঝায় না। যাহারা কবিতা লিখিয়া থাকে তাহাদিগকে সৌজন্যবশত এ নাম দেওয়া হয়। যাহাদিগকে 'কবি' বলিতে বাধে, তাহাদিগকেই 'সুকবি' বলিয়া ভদ্রতা রক্ষা করা হয়। ইহা আপনার মত সাহিত্যিকের নিশ্চয় জানা আছে। রবীন্দ্রনাথকে 'সুকবি' বলিলে অপমান করা হয়। আর 'সাহিত্যরসিক' বলিলে যাহা বুঝায় তাহা সাহিত্যসেবীমাত্রেরই বিশেষণ। আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে তাহা জানি এবং সে শ্রদ্ধা আপনারই সাহিত্যজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক—অতএব পাঠকসমাজে আপনি নিজের প্রতিই অবিচার করিয়াছেন। তা ছাড়া উৎসর্গপত্রে নিক্‌তির ওজন রক্ষা না করিলে কার্পণ্যের পরিবর্তে উদারতা প্রকাশ পাইলে লোকে আমাকে নয় আপনাকেই অধিকতর 'গুণী' বলিয়া বুঝিত। আমি 'সাহিত্যরসিক ও সুকবি' অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যসমাজে আমি ব্রাহ্মণ ত নহিই—সৎ শূদ্রও নই, তবে জলাচরণীয় বটে। ইহাই ঘোষণা করিবার জন্য কি আপনি বইখানি আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন? নিশ্চয়ই তা নয়; আমি তাহা জানি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম।

আমার স্বাস্থ্য ক্রমেই আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এত খারাপ ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না। ভয় হয়, বোধহয় আর বেশি দিন বাঁচিব না। আপনি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩

Bagnan P.O.
5. 11. 46

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 'বিজয়ার সম্ভাষণলিপি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি; আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।

বাংলাদেশের অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহাতে হিন্দু বাঙ্গালীর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই—বাঁচিয়া থাকিতেও দিবে না। সমপ্রদেশ একটি বিরাট হত্যাশালায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর চেয়ে যাহা নিদারুণ হইয়াছে তাহা নারীর উপরে পৈশাচিক অত্যাচার। উহাতেই বাঙালী হিন্দুর শুধু দেহ নয় আত্মাও নিহত হইতেছে। আমাদের ধর্মসংস্কৃতি ও সাধনার যাহা মূল তাহাই ছিন্ন হইতেছে। দারুণ অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া ইহাও ঘটিল।

একে আমার স্বাস্থ্য অতিশয় ভগ্ন হইয়াছে সাংসারিক নানা সঙ্কট ও দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। তাহার উপরে জাতি ও সমাজের এই চরম অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ততই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সাহিত্যচিন্তা বা ভাবসাধনার সময়ও ইহা নয়। কয়েকখানি পুস্তক প্রেসে বন্ধ হইয়া আছে, এ অবস্থায় সে কাজও বন্ধ। দেশের এই অবস্থা চিন্তা করিয়া কিছু লিখিয়াছিলাম—শ্রীমান্ সুরেশ দুইখানি পুস্তকের আকারে তাহা ছাপিতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ।

কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজী বাঙালী এখনও বুঝিল না—এখনও গান্ধী ও নেহেরু এখানে আসিতে সাহস করে। ইহাই সব-চেয়ে দুঃখ দিতেছে। এ জাত বাঁচিবে কেমন করিয়া?

ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি, যে, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইলে তিনি যেন এই জাতিকে উদ্ধার করেন—এখনও আশা ত্যাগ করি নাই।

মাঝে মাঝে কুশলসংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৪

বড়িশা
শুক্রবার ।১২।৩।৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড এইমাত্র পাইলাম। আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন সে সংবাদ ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি—এবং আপনি যে আমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিবেন তাহাও আশা করিয়াছিলাম।

আপনি যদি আগামী বুধবার বিকালের দিকে (৪-৫টা) 'বঙ্গদর্শন' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন তাহা হইলে আমি ঐ দিন সেখানে ঐ সময় থাকিব।

আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
C/o শ্রীহরিপদ ব্যানার্জী
১৩/১ হেম ব্যানার্জী লেন
শিবপুর—পো
হাওড়া

৫

বড়িশা
১২।৭।৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কার্ড পেয়ে খুশী হলাম। আপনার কুশলসংবাদ মাঝে-মাঝে পেলে সুখী হব। তার কারণ আপনি আমার একজন আত্মীয়, অর্থাৎ আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আমার আত্মীয় খুব কম। গত যুদ্ধ এবং তারপর স্বাধীনতালাভ এই দুইটি মহাশান্তির ফলে বাংলাদেশে 'আত্মা' জিনিসটা প্রায় লোপ পেয়েছে—তাই 'আত্মীয়' আরও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। একটা মানুষও নেই যার সাধুতা এবং প্রেম স্বার্থহীনতা আছে, সত্যানুরাগ তো পরের কথা। তাই বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। আপনার মতো মানুষের অস্তিত্ব স্মরণ হলে একটু আনন্দ পাই।

আপনি 'বঙ্গদর্শনে' লেখার সম্বন্ধে যে কৈফিয়েৎ দিয়েছেন তার দরকার ছিল না, কারণ আপনাকে আমি জানি; 'বঙ্গদর্শন' আমারও একটা নিঃস্বার্থ ব্রতের মতো—ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থবাণীর কোন সম্পর্ক নেই, এটা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। এ জন্যে আমার কোন কারণে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ হবার আশঙ্কা নেই। আপনি এ পর্যন্ত যে লেখাগুলি দিয়েছেন, সেগুলি আমার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে আপনার সাত্ত্বিক দান বলেই গ্রহণ করেছি।

এই কথা আমি আর সবাইকে জানিয়েছিলাম যাদের আমি সাহিত্যিক বলে শ্রদ্ধা করতাম; একটা ভুল করেছিলাম, সাহিত্যিক হলেই যে মানুষ হবে এমন কথা নেই। তা জেনেও আমি তাদের কাছে ঐরকম সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম, তার শাস্তিও খুব পেয়েছি। এই কয় মাস 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করে একটা শেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—সে হচ্ছে এই যে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যেমন, তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রেও পলিটিক্স পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করেছে। জীবনের কোনখানেই আর শুচিতা রইল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্ক, এমনকি আত্মীয়সম্পর্কও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি পরিবারের সম্পর্কও কলুষিত হয়ে উঠছে। নিদারুণ অর্থপিপাসা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনা বাঙ্গালী জাতটাকে পেয়ে বসেছে—আর কোন চিন্তা তার নেই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে আমি আরও হতাশ হয়ে পড়েছি—সাহিত্যের নামে বাঙালীর কোথাও একটু সদবুদ্ধির জাগরণ হয় না। অথচ ঐ একটা ক্ষেত্রে বাঙালীর অতিশয় অধঃপতিত আত্মাও চিরদিন সঙ্গ দিয়েছে। সর্ব্বস্তরের শিক্ষিত বিদ্বান ও প্রতিভাবান বাঙালীর দ্বারস্থ আমি হয়েছিলাম কিন্তু দুই-চারজন ছাড়া, আমি তাদের যে চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার নিজের উপরেই ঘেন্না ধরে গেছে। আপনি কোন কারণে লজ্জিত হবেন না। আমি আপনাকে চিনি। আপনার দুর্ব্বলতা কোথায় তাও যেমন জানি, তেমনই আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে তাও জানি। আপনাকে পুনরায় আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

'বঙ্গদর্শন' চালানো প্রায় দুঃসাধ্যসাধন। তার কারণ কলকাতার আবহাওয়া এর পক্ষে বড়ই প্রতিকূল। আপনি বাঙালী হয়েও বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকেন—দূর থেকে অনেক জিনিস চোখে পড়ে না। তার উপর বাংলা সংবাদপত্রগুলো এক-একটা মিথ্যার জাহাজ। নইলে আপনিও নিঃসন্দেহে বুঝতে পারতেন, এ জাত আর বাঁচবে না। এমনকি মরেই গেছে। যদি মরেই গিয়ে থাকে (আমি এতদিন তা নিশ্চিত বলে মনে করিনি) তা'হলে বঙ্গদর্শন-এর আর কি কাজ? বঙ্গ-অদর্শনই যে আরও সত্য। আমারও জীবনের শেষ হয়ে এসেছে। অনেকদিন থেকেই মৃত্যু আক্রমণ করছে, কেবল দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে, সত্যের নামে, আমি একটা অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করে সেই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দেখেশুনে আমি আর পারলাম না—জরা ও ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করে আমি যে গাণ্ডীব তুলে ধরেছিলাম হাত থেকে তা খসে পড়েছে—

'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে'

বাঙালী জাতির বিধাতা যিনি তিনিও আমার প্রাণের ভিতরে ডেকে বলছেন—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥

যে সত্যকে সারাজীবন আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে অর্চ্চনা করেছিলাম সেই সত্যই আমার প্রাণের শেষ মিথ্যাকে—ঐ আশাকে—ধ্বংস করে দিচ্ছে।—সত্যের জন্য আমি বহু অপমান, বহু লাঞ্ছনা, বহু নিন্দে মাথা পেতে নিয়েছি, আমার পরিচয়টা নানা উপায়ে ও নানা আকারে বিকৃত হয়েছে, তার কারণ, আমি কারো মিত্র নই—সকলেরই শত্রু,—আমার সেই আত্মনিরপেক্ষ সত্য, আত্মসর্বস্ব বাঙালীর বড়ই অপ্রীতিকর হয়েছে। সেই শত্রু এতদিনে বোধহয় নিপাত হবে। হওয়াও সঙ্গত; কারণ আমি উনবিংশ শতাব্দীর অর্থাৎ বাঙালীর শেষ অগ্নিযুগের শেষ অগ্নিকণা। এতে কোন আত্মশ্লাঘা নেই—এটাও সত্য আত্মনিরপেক্ষ সত্য, আমার পরিচয় যদি কখনও কারো জানবার প্রয়োজন হয়, তবে এই কথাটা যে কত বড় তা স্বীকার করতে হবে। আমার সঙ্গেই সেই যুগের শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ সে যুগের শেষ চিহ্ন মুছে যাবে। আমি বড় নই—ছোট, আমি সেই আগুনের শিখা নই—একটা স্ফুলিঙ্গমাত্র; তবু সেই আগুনের শেষ কণা এইবার নিভে যাবে।—বিধাতার অমোঘ বিধানে।

এ চিঠি পড়ে আপনার কষ্ট হবে তা জানি; কিন্তু ভগবান যদি বিরূপ হন তবে দুঃখ করাও যে মিছে; আমি এও জানি যে ভেবে দেখলে অসত্য কিছুই নাই—সবই সত্য। ঐ যে দেশের মানুষ ওদের ভিতর দিয়েই সেই সত্যের ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঐ মানুষগুলোর ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে বলছেন—আমার এই সাধনা কালকে অতিক্রম করতে চাইছে তাই এ সাধনা এ কালের পক্ষে ব্যর্থ হবেই। তিনিই সৎ, আবার তিনিই অসৎ, সৃষ্টিও তিনি ধ্বংসও তিনি; এখন তাঁর ধ্বংসমূর্তি—'কলোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো'।

আমি কেবলই গীতার সেই অধ্যায়ের সেই রূপ স্মরণ করছি। আপনাকেও স্মরণ করতে বলছি। তবু আমার মন বড়ই অবসন্ন; একটু সাহায্য, একটু সাহস, একটা আশাও যদি পেতাম। কিন্তু সেটাও মনের দুর্ব্বলতা, দেহটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ থাকবে।

আপনাকে গল্প লেখার জন্যে আর তাড়া দিতে বোধহয় হবে না। একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানাচ্ছি।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬

বড়িশা
১৭—৮—৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

অনেকদিন আগে আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম—একটু বড় চিঠি তাতে Blood Pressure বৃদ্ধির খুব বেশী কষ্ট হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। আপনি কিন্তু সুচিকিৎসকের মতো সে চিঠির আর কোন উত্তর দেন নি; কারণ ও রোগে, বকুনির প্রশ্রয় দেওয়া বড় বিপদজনক, Blood Pressure এখনও আছে। তবে বোধহয় একটু কম; তাই আপনাকে আবার চিঠি লিখতে বসেছি—আশা করি এবার উত্তর দেবেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রায় ডুবুডুবু হয়ে বহু কষ্টে আবার একটু মাথা তোলবার চেষ্টা করছে, কতদূর সফল হবে, তা আমি বলতে পারিনে। আমার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র আশা বা ভরসা নেই। কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য বললেই হয়। এবং যদিও কখন কবে—আমরাই আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো পূর্ব্ব পাকিস্তানে তার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর যদি কংগ্রেস কর্ত্তাদের (আংলো মুসলিম Axis-এর) কোন রকমে হাতে পায়ে ধরে জানটা

বাঁচাতে পারেন। (তাও একেবারে অসম্ভব নয়) তা' হলেও বাঙ্গালী কি কারণে এবং কি উপায়ে নিশ্চিহ্ন হবে তাও আমি প্রত্যক্ষ করছি এবং সেটা শুরু হবে খুব শিগ্‌গির—একরকম শুরু তো হয়েই গেছে। অতএব আমি বঙ্গদর্শন যে আরও এক বছর চালাতে পারবো তার ভরসা পাইনে। তবু দিনগত পাপক্ষয় করতেই হয়, সেই হিসেবে আমি আগামী বৎসরের যে ক'মাস পারি 'বঙ্গদর্শন' চালিয়ে যাবার সংকল্প করেছি অবিশ্যি যদি ওরা পারে।

এখন আপনার কাছে আমার একটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বলব না—প্রার্থনা এই যে আপনি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্যে আমাকে একটি গল্প লিখে দেন। জানি এই সময়ে আপনাকে এরকম তাগিদ দেওয়া নিষ্ঠুরের কাজ কিন্তু জানেন তো necessity has no law. তার জন্যে আপনাকে বঙ্গদর্শন যথাযোগ্য প্রণামী দেবে। জানি প্রণামীর জন্যেই আপনার কলম সবল হয়ে উঠবে না ওটা কেবল জানিয়ে রাখলাম, কারণ আপনার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করেছি। আরও কারণ, দ্বিতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শন আশ্বিন থেকে বেরুবে—যাত্রা বদল করবে। আবার ওটা পূজা সংখ্যাও বটে। তাই একটা গল্প না থাকলে বাজারে বেরুনো অসম্ভব। আপনি ছাড়া আর কেউ তো বঙ্গদর্শনের বিশিষ্ট গল্প-লেখক নন। তাই আপনার উপরে এই কর্ম্মফলের বোঝা চাপছে। আশা করি কুশলে আছেন। আমার অবস্থা পূর্ব্ববৎ আপনি আমার স্নেহ শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ নমস্কার এবং আলিঙ্গন নেবেন।

বঙ্গদর্শন বরাবর পাচ্ছেন তো?

ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৭

বড়িশা
১০. ৯. '৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

গল্প পেয়েছি। আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আপনার লেখা, কাজেই সুপাঠ্য হবেই। 'বঙ্গদর্শনের' পক্ষে তাই যথেষ্ট। এ গল্পটিতে আপনি যে গল্পবস্তু আশ্রয় করেছেন তার বক্তব্যটাই হয়েছে বড়; অর্থাৎ খুব সাময়িক—সকলের বর্তমান মনের অবস্থা ওর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে 'বঙ্গদর্শনের' উপযোগী হয়েছে।

আজ শুধু প্রাপ্তিসংবাদ দিলাম, এরপর আবার চিঠি দেবো, তাতে আরো খবর পাবেন। 'বঙ্গদর্শনের' বিপদ এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে আপনাকে সব জানাবো।

আশা করি কুশলে আছেন। কলকাতায় এলে যেন দেখা পাই।

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আলিঙ্গন নেবেন। ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৮

বড়িশা
১২।১০।৪৮

প্রীতিভাজনেষু,

আমার ৺বিজয়ার প্রীতিপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন ও নমস্কার পাঠাইলাম। আমার পত্র পাইয়াছেন? 'বঙ্গদর্শন' আপনাকে টাকা পাঠাইয়াছিল কিনা তাহা আমি এখনও জানি না। অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনার কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবেন।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৯

বড়িশা
২৪ পরগণা
ইং ১৫।১০।৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার বিজয়ার প্রীতিনমস্কার পাইলাম: আমি এবার দেরী করিয়াছি, আপনি আমার প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন ও কুশল কামনা জানিবেন। আবার কবে কলিকাতায় আসিতেছেন? আসিলে যেন দেখা পাই।

আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন।

ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১০

বড়িশা
২৪ পরগণা
ইং ২০।২।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমিও অনেকদিন আপনার সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম।

আমি এখনও কোন পত্রিকা হাতে পাই নাই। উপস্থিত Publications লইয়া আছি, অনেকগুলি বই তৈয়ারী করিয়া দিতে হইল। সম্ভবতঃ এখনও কিছুদিন বই লেখার কাজই করিতে হইবে। নহিলে জীবিকাসঙ্কট ঘুচিবে না।

আপনি এখন কি করিতেছেন? আর কোন লেখা আরম্ভ করিয়াছেন? আমার একখানি "বিদেশী ছোটগল্প সঙ্কলন" (অনুবাদ) বাহির হইতেছে, বইখানি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি।

কলিকাতার দিকে আবার কবে আসিতেছেন? আসিলে যেন দেখা পাই।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন জানিবেন। গোপাল ও গোপালিকাকে আমার স্নেহাশিস জানাইবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১১

বড়িশা
(২৪ পরগণা)
ইং ৫।৬।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মাতৃদায় হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাইয়াছি মায়েরই পুণ্যে।

আমার প্রকাশক (কমলা বুক ডিপো) আপনাকে "বিদেশী ছোটগল্প সঙ্কলন" নবখণ্ড পাঠাইয়াছেন। আশা করি এতদিনে তাহা হস্তগত হইয়াছে। আমার অনুরোধ, আপনি উহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে আপনার অভিমত জানাইবেন। দেরী হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া সমস্ত বইখানি (ভূমিকা-সমেত) পড়িতে বলি।

এবার গোপাল এখনও দেশে আসে নাই। তাহার সংবাদ কি? আপনি বোধহয় শীঘ্র আর আসিবেন না, আসিলে সংবাদ দিবেন।

আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ভালোবাসা জানিবেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১২

বড়িশা পোঃ
(২৪ পরগণা)
ইং ৯।৭।৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি—শরীর অসুস্থ, এবং নানা কারণে মনও অসুস্থ বলিয়া উত্তর দিতে দেরী হইল।

অনুবাদের, এবং সাহিত্যিক ভাষা সম্বন্ধে আপনার যে মনের সমস্যা সে সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। একটি সাধারণ normal Idiom-এর উপরে সাহিত্যিক (art-এর) সপ্ততন্ত্রী বাঁধিয়া লইতে হইবে—একটা হইবে Ground—সেই Ground-এর উপরে ঐ ভাষার সপ্ততন্ত্রী বা সপ্তবর্ণের সুর ও রং খেলিবে। ইহা সাহিত্যিক ভাষায়—সাধারণ ভাষায় আছে। তার উপর, লেখকের নিজস্ব স্টাইল,—তাহা নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। ঐ সাহিত্যিক ভাষায়—অর্থাৎ, রূপসৃষ্টির ভাব রসসৃষ্টির ভাষায়, কথ্য ও সাধু, বঙ্কিমী ও বিদ্যাসাগরী, রাবীন্দ্রিক—সকলই আবশ্যক মত লুকাচুরি খেলিতে পারে—কিন্তু লেখকের সেই মিশ্রণশক্তি চাই - রংয়ের 'harmony'-র মত। Dialogue-এ সাধু-ভাষা চলে না বটে, কিন্তু art-এর প্রয়োজনে চলেও। এ বিষয়ে সাক্ষাতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শুনিলাম গোপাল খুব পীড়িত, সে এবার বাড়ী আসে নাই। আপনি তাহার সংবাদ পাইলে জানাইবেন।

আবার কবে আসিতেছেন?

আশাকরি কুশল। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ, আপনি গল্পগুলির সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। কোন্ কোন্ গল্প আপনার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে তাহা লেখেন নাই। আমি সেই সংবাদই চাহিয়াছিলাম। গল্পগুলির নির্ব্বাচনে রসের বৈচিত্র্য আমার লক্ষ্য ছিল।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৩

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ২।৯।৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। অনেক দিন দেখা পাই নাই। মাঝে নিশ্চয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন?

আপনি আমার "জয়তু নেতাজী" পড়িয়াছেন ও ভাল লাগিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশাকরি দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িয়াছেন। তাহাতেই গান্ধী ও গান্ধী-কংগ্রেসের স্বরূপ আমি পূর্ণ উদ্ঘাটন করিয়াছি। 'পরিশিষ্ট' ভাগে তাহা আছে।

নূতন উপন্যাস চলছে শুনে সুখী হ'লাম। ছোটগল্প আর লিখছেন না?

আশা করি, সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। কলিকাতায় আবার কবে আসিতেছেন? আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৪

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ২৭।১০।৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৺বিজয়ার সম্ভাষণ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনিও আমার ঐদিনের প্রীতিপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।

আমার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হইয়াছে। প্রায় Invalid অবস্থা, এ যাত্রা রক্ষা পাইব বলিয়া মনে হয় না। পুরানো chronic ব্যাধি প্রবল হইয়াছে। তাই বড় কষ্ট পাইতেছি।

আপনি কলিকাতায় আসিলে একবার দেখা দিবেন—অনেকদিন দেখি নাই।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৫

বড়িশা
ইং ২৪।১২।৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বিভূতিবাবু, অনেকদিন কোন খবর পাইনি, আশা করি কুশলে আছেন।

পত্রবাহক শ্রীমান্ শোভন বসু, আমার নিত্যপরিচিত, স্নেহভাজন, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী যুবক। সে ঐদিকে বেড়াইতে গিয়াছে; তাহার ইচ্ছা দ্বারভাঙ্গায় ঘুরিয়া আসে এবং আপনার সহিত দেখা করিয়া আপনার উপদেশ গ্রহণ করে।

আশা করি আপনি তাহাকে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিবেন।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও আলিঙ্গন জানিবেন।

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৬

বড়িশা, মঙ্গলবার

প্রীতিভাজনেষু,

এইমাত্র আপনার কার্ড পাইলাম। আপনি কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। দেখা

যেমন করিয়া হোক—হইতেই হইবে। আমি 'বঙ্গদর্শন' অফিসে এখন আর যাই না; তার কারণ, কাজ যা কিছু এইখানে বসিয়াই করিতে পারি। বুধবারে যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, হয়তো আপনি ঐবারেই বঙ্গদর্শন অফিসে আসিবেন; এ চিঠি পাওয়ার সময় আর নাই। আমার শরীর এত খারাপ যে, ট্রামে বাসে চলা-ফেরা করা বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। যদি আপনি দয়া করিয়া আমার এখানে আসেন, তবে অনেক কথা আছে। আসিলে সুখী হইব। আর শনিবারে যদি পারি কলিকাতায় কোথাও দেখা হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনি General Printers-এর ময়ূরবাবুর কাছে সংবাদ পাইতে পারেন—আমি সেইখানেই খবর পাঠাইব।

আপনি কতদিন থাকিবেন এবং ঐ ঠিকানাতেই কিনা, তাহা জানাইবেন।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
২, কালু ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯।

* শেষের চিঠিতে মোহিতলাল তারিখের উল্লেখ করেন নি। তবে পোষ্টকার্ডে ডাকঘরের মোহরে বোঝা যায় তারিখটি ২৮।৯।১৯৫২।

১

ভালো নেতৃত্বের অভাব প্রসঙ্গে

'চতুরঙ্গ' (বর্ষ ৪৮। সংখ্যা-৩। জুলাই ১৯৮৭) পত্রিকায় বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক আবুল কাশেম ফজলুল হক লিখেছেন "বাংলাদেশে ভালো নেতৃত্বের অভাব কেন ?" প্রবন্ধটি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির চরম অবক্ষয়ের সময়ে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর সম্পাদিত "লোকায়ত" পত্রিকায় নৈতিকতা এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এ প্রবন্ধেও তিনি নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষের মনোবৃত্তি, আচার-আচরণ, ভালো-মন্দ দিকের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতি প্রসঙ্গেও। এদেশে ভালো নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার জন্য জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের তিনি দায়ী করেছেন, দায়ী করেছেন বুদ্ধিজীবীদের। এ দেশে ভালো নেতৃত্বের অভাব প্রসঙ্গে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্তমানে কিছুটা চিন্তাভাবনা করছেন, তবে যাঁর-যাঁর শ্রেণীগত স্বার্থের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। এই দিকটি হয়তো লেখক আলোচনা করতে পারতেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির পরনির্ভরশীলতার কারণে যাঁরা রাজনীতি করছেন, দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা পরনিয়ন্ত্রিত। সাম্রাজ্যবাদ এদেশের দলগুলোকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর "ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান" গ্রন্থে বলেন, 'এ রাষ্ট্র যতদূর পর্যন্ত আবশ্যিক ততদূর পর্যন্তই যৌক্তিক বা যুক্তিসিদ্ধ এবং যদি তা সত্ত্বেও এটি আমাদের কাছে অশুভ বলে প্রতীয়মান হয় এবং অশুভ চরিত্র সত্ত্বেও যদি তা টিকে থাকে তা হলে সরকারের অশুভ চরিত্রটা সঙ্গত এবং তার ব্যাখ্যা মিলবে প্রজাদের পালটা অশুভ চরিত্রের মধ্যে। তখনকার প্রুশীয়রা যে-রকম সরকার পাবার উপযুক্ত ছিলেন তারা তাইই পেয়েছিল।' এঙ্গেলসের প্রাগুক্ত কথার প্রতিধ্বনি লেখকের এই প্রবন্ধে এবং 'চতুরঙ্গে' পূর্বে প্রকাশিত 'বিবেক যুক্তি ও প্রগতি" প্রবন্ধে লক্ষণীয়। যেমন 'যে জনগণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য হয় সেই জনগণ তখন ঠিক সেইরকম নেতৃত্বেরই অধিকারী হয়।' (২১৪ পৃ) লেখক এ নিবন্ধে বাংলাদেশের নেতাদের নেতৃত্বে মানবিক গুণাবলির ব্যাপক অভাব লক্ষ করেছেন, যা বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। মহান নেতা হওয়া এবং নেতৃত্ব দেবার জন্য এদেশের নেতাদের জনগণের ছাত্র হয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, কিন্তু নেতারা নিজেদের পণ্ডিত এবং শিক্ষক ভেবে আত্ম-অহমিকায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। নেতারা এখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহৎ বাক্য বর্ষণ করলেও জনগণ সাড়া দিচ্ছে না। সাধারণ জনগণকে নেতারা যদি মূর্খ অজ্ঞ ভাবেন তা হলে ভুল করবেন। জনগণ বিভিন্ন সময় দল দ্বারা প্রতারিত হতে-হতে কোনো দলের প্রতি এবং সরকারের প্রতি আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। ভালো নেতৃত্বের এও এক সমস্যা।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সামরিকতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ইসলামতন্ত্রের রাজনীতি পরিচালিত, এতে কোন ইজমেই একক নেতৃত্ব নেই। বিভিন্ন ফ্রন্ট গড়ে উঠলেও ভেতরে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ইজমের দ্বন্দ্বে ভবিষ্যতে আমরা কি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব ?

আমাদের এখন চাই নেতা এবং জনতার সচেতনতা,

মানবিক মূল্যবোধ অর্জন, যার মাঝ থেকে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। যে-কোনো দেশের সমগ্র জনগণ সমান সচেতন আর সক্রিয় নন। সাধারণত এঁদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। মাওসেতুং "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন" প্রবন্ধে বলেন—'যে-কোনো স্থানের জনসাধারণই সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত—অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, মধ্যবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। তাই, অল্পসংখ্যক সক্রিয় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি নেতৃগোষ্ঠী তৈরি করতে নেতাদেরকে অবশ্যই নিপুণ হতে হবে ; এবং পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। প্রকৃতই ঐক্যবদ্ধ ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত একটা নেতৃগোষ্ঠী—কেবলমাত্র গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে পারে—তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়।'

বাংলাদেশে বর্তমানে যে ফ্রন্ট-ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশের নেতা আর কর্মীদের ভাবনা আর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন বাংলাদেশের

রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক দল ও সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ। প্রয়োজন বাংলাদেশের চিন্তাবিদদের বাংলাদেশে ভালো নেতৃত্ব-সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না থেকে সঠিক, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির বাস্তব কর্ম। জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক-এর বক্তব্য এই দিকেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ভালো নেতৃত্বের অভাব চলছে, এই অভাব দূর হবার কি কোনো সম্ভাবনা নেই ? খারাপ নেতৃত্বে কোনো জাতি তো চিরদিন চলতে পারে না, কঠিন কঠোর তিক্ততা থেকেই নতুন কিছু বেরিয়ে আসে। প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে লেখকের আরো গভীর, চিন্তামূলক ও বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ চাই। বিশ্লেষণ চাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে।

আমান সাঈদ
মুনশীগঞ্জ, ঢাকা

২

অ্যা / এ্যা / য়্যা=এা—ঁ

চতুরঙ্গ, জুলাই ১৯৮৭ সংখ্যায় মতামত বিভাগে শ্রী সুনীল লাহিড়ী মহাশয় লিখিত "য়্যা স্বরধ্বনির প্রতীকবর্ণ চাই" এবং শেষে যোজিত চতুরঙ্গ-সম্পাদকের বক্তব্য পড়লাম।

এ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীলাহিড়ী য-ফলার ছয়টি বিভিন্ন উচ্চারণগত পার্থক্যের কথা বলেছেন। যা হোক, তিনি আরও একটু লক্ষ করলে দেখতেন যে, য-এ বিন্দু দিয়ে গঠিত য়-বর্ণটির ধ্বনি বাঙলায় সবচেয়ে জটিল। আসলে এটি (য়) বাঙলায় প্রচলিত য-এর প্রকৃত উচ্চারণ। আগামী দু-তিন দশকের মধ্যে মনে হয় য় তার জটিল উচ্চারণের শাখায়িত চরিত্রটি প্রকাশ করবে।

বাঙলা বক্র-আ (তথা বাঁকা-আ) বা বিকৃত এ, অর্থাৎ অ্যা / এ্যা / য়্যা নিয়ে এর আগে অন্যত্র আলোচনা দেখেছি, এবং তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে না গিয়ে এর মধ্যে থেকেই এটির জন্য প্রতীকবর্ণ খুঁজতে হবে। যদি এটির জন্য একেবারে ভিন্ন কোনো নতুন লিপি তৈরি করা হয়, যার কোনো টাইপ ছাপাখানায় নেই, তাহলে সেই লিপি নিজেই একটা সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলবে। তা ছাড়া, সেই লিপির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতা প্রমাণিত হতে বহু সময় কেটে যাবে। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) যেমন এইজন্য যে লিপির প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার জন্য ছাপাখানায় নতুন টাইপ তৈরি করা দরকার। আপনারা যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন তার জন্যও নতুন টাইপ লাগবে। হাতেও কি সহজে এবং দ্রুত লেখা যাবে, বারে বারে কলম না তুলে ?

রবীন্দ্রনাথ অ্যা-কার (া) রোজাবার জন্য মাত্রা-সহযোগে এ-কার [ে] ব্যবহার করেছিলেন। বিশ্বভারতী এখনও তা পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু মাত্রাহীন এ-কার এবং মাত্রাযুক্ত এ-কারের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ লোক এ-কার এবং অ্যা-কার-এর পার্থক্য ধরতে পারছেন না, পার্থক্য লক্ষ করছেন না। কিছুদিন আগে বিশ্বভারতীতে এক আলোচনাসভায় ড. পবিত্র সরকারের প্রস্তাবমতো অ্যা-এর জন্য একটি নতুন হরফ প্রচলন করার কথা হয়েছিল।

বক্র-আ নিয়ে অনেক শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তিই আলোচনা করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চেয়েছেন —অ্যা। পূর্ববঙ্গের সরকারি ভাষাকমিটি সুপারিশ করেছিলেন—অ্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত বানানে (১৯৩৭) এটির জন্য প্রতীক নির্ধারিত হয়েছে—অ্যা, শব্দমধ্যে া। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চেয়েছেন—এ্যা। পরেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত—এা। ধীরানন্দ ঠাকুর—এ্যা (বাংলা উচ্চারণকোষ)। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে ব্যবহার করা হয়েছে—এা। দেবপ্রসাদ ঘোষ চেয়েছিলেন য়্যা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রস্তাব হল—এা। বক্র-আ বা বিকৃত-এ (অ্যা) নিয়ে আমি দুটি সাময়িক পত্রে পৃথক দুটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলাম (বাংলাভাষায় "এ্যা" ধ্বনি—"সাহিত্য ও সংস্কৃতি", শারদীয় ১৩৮৪ / জুলাই-সেপ্টেমবর, ১৯৭৭) এবং ভাষাবিজ্ঞানের পত্রিকা ভাষা-তে (বাংলাভাষায় বক্র-অ—"ভাষা", মে-অকটোবর, ১৯৮৩)।

লক্ষ করেছি, পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবের সাথে আমার প্রস্তাব বহুলাংশে মিলে গেছে। যদিও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখার আগে অবধি বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবটি আমার জানা ছিল না। আমার প্রস্তাব, বক্র-আ বা বিকৃত-এ (তথা অ্যা / এ্যা / য়্যা)= এা হোক, এবং শব্দমধ্যে চিহ্ন হবে, এা=ঁ অর্থাৎ, (মাত্রাবিযুক্ত) এ-কার [ে] উলটে দিয়ে তার সাথে আ-কার যুড়ে।

এর ব্যবহারিক যোগ্যতা বিচার করার জন্য চিহ্ন দুটি ব্যবহার করে লেখা কয়েক পংক্তি ছেপেও দেখা হয়েছে। কিন্তু চিহ্নটি নতুন তৈরি হরফ নয় বলে অবশ্য এর ব্যবহার-যোগ্যতা প্রমাণের বিশেষ দরকারও নেই। এইভাবে "এা" লিখলে আলাদা করে বরং এর উচ্চারণ শেখার দরকার হবে না। আর, য-ফলা আ-কার=্যা-চিহ্ন এবং প্রস্তাবিত ্যা-চিহ্ন খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ, ফলে ব্যাপারটা সহজ গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহার অনায়াস হয়ে উঠবে। হরফের ডাইনে এটি বসাবার সহজ সুবিধাও রয়ে গেছে। এর ফলে প্রচলিত লিখন এবং পাঠ অভ্যাস বিশেষ বাধাগ্রস্ত হবে না। হাতে কমপোজ করার ছাপাখানায় এটিকে ব্যবহার করে কমপোজ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

যদি স্বরধ্বনির অবস্থানের রেখাচিত্র লক্ষ করি তবে দেখতে পাব—এ আর এা পাশাপাশি ধ্বনি। পূর্বে এা বর্ণ না থাকার জন্য এটি "এ" দিয়ে বোঝানো হত। এক, এখন, ঠেলা, বেড ইত্যাদি লিখে পড়া হয়—এাক, এাখন, ঠ্যালা, ব্যাড।

সম্ভবত ইংরেজি ভাষার প্রভাবে এা-ধ্বনিটি বাঙলায় এসেছে। কারণ, ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে "হুতোম প্যাঁচার নকশা" (কালীপ্রসন্ন সিংহ) রচিত হবার আগে অবধি এা=্যা এাতথানি স্পষ্টভাবে প্রযুক্ত হয় নি।

অ্যা / এ্যা / য়্যা=এা—এ লেখার সুবিধা এই যে, এতে ধ্বনিটি স্পষ্টতর হচ্ছে, এবং স্বরবর্ণের লিপি তৈরিতে ব্যঞ্জনচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে না। লেখা ও ছাপা একটি অতিরিক্ত য-ফলা (্য) মুক্ত হয়ে অধিক গতিযুক্ত হচ্ছে। যেমন—'এাকা এাকা এাক দিন এাক ব্যাট নিয়ে হ্যাঁলাফ্যাঁলা করে খ্যালা করতে গেলাম।' হাতে করে লেখার সময়েও এতে লেখার গতি ব্যাহত হচ্ছে না।

আমার লেখা অন্য দুটি প্রবন্ধেও এা প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে (বাংলা স্বরবর্ণের সজ্জা—"আজকাল", ৪/১২/৮৪ এবং বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সজ্জা—"প্রমা", জানু-মার্চ '৮৬ এবং এপ্রিল-জুন '৮৬)। উৎসাহী পাঠকেরা এই প্রবন্ধ দুটিও দেখে নিতে পারেন।

মনোজকুমার মিত্র

৩

সেপটেমবরের টেনশন

ট্রামেবাসেপথেঘাটে বেরোলেই এখন এক আলোচনা। না, না, পুজোর জামাকাপড়শাড়ির মামুলি আলোচনা নয়—বাচ্চাদের স্কুলে ভরতি করানোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা। সেপটেমবর মাস থেকেই স্কুলে-স্কুলে ফর্ম্-বিলি শুরু হয়ে যায়, আর বাবা-মায়েদের শুরু হয়ে যায় টেনশন। "ফরম্ ফিলাপ" করার পর থেকেই ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো শিশুদের ওপর আরম্ভ হয়ে টরচার। 'টরচার' কথাটা ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হল। কারণ বাবা-মায়ের কড়া হুকুম—এ সময়ে খেলা বন্ধ। যত পার জানো, জ্ঞানের পাহাড় হয়ে গিয়ে বসো ভরতির পরীক্ষায়। ক্লাস ওয়ানে ভরতি হবার জন্যে শিখে যাও যোগবিয়োগগুণভাগ, দশমিক, কঠিন-কঠিন প্রশ্নের অঙ্ক, ইতিহাসভূগোলবিজ্ঞানবাঙলা, সাধারণ জ্ঞান—কী নয়! কে প্রথম গ্র্যাজুয়েট থেকে শুরু করে কে দাবায় গ্র্যানডমাস্টার?

কয়েকজন বাবা-মাকে বলেছিলাম, 'বাচ্চাকে এইভাবে টরচার করছেন কেন? আপনাদের কষ্ট হয় না?' সবারই এক উত্তর: কী করব বলুন, এখন "দয়া" দেখাতে গেলে তো স্কুলে ভরতি করা যাবে না!'

সত্যিই তো, বাবা-মায়েরই বা কী করার আছে? শিক্ষা তো নিতেই হবে, আর তার চাপ ওই শিশুটাকে সহ্য করতেই হবে। আসলে এটা তো অ্যাডমিশন টেসট নয়, এলিমিনেশন টেসট। এলিমিনেশন এড়াবার জন্য শিশুকে প্রাণান্তক সংগ্রাম চালাতেই হবে।

প্রশ্নটা স্কুলের কয়েক জন মাস্টারমশাইকেও করা হল। উত্তর: 'কী করব বলুন, আমরা নিরুপায়। এত বাচ্চা আসে, সবাইকে তো আর নেওয়া যায় না! তাই এই ব্যবস্থা।' বললাম, 'আচ্ছা, বাচ্চারা প্রচণ্ড মুড হয়। পরীক্ষার দিন কারও মুড হয়তো ভালো থাকল, কেউ-বা অফ-মুড—তার ওপর নির্ভর করে আপনারা পরীক্ষা নিচ্ছেন কিন্তু।' বললেন, 'সবই বুঝি, কিন্তু নিরুপায়।'

আসলে, সবাই দায়িত্ব এড়াতে চান। কেউই ভাবছেন না, ভাবতে চাইছেন না—কয়েক বছর পরে এই সমস্যা কী উৎকট রূপ নেবে, পরের প্রজন্মকে কিভাবে দেহেমনে পঙ্গু করে দেবে। আমরা কি জড়বুদ্ধি বা সৃষ্টিশীল চিন্তায় অক্ষম প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই? এ নিয়ে অবিলম্বে চিন্তাভাবনা হওয়া উচিত। সরকার যে প্রথম শ্রেণীতে ভরতি হওয়ার ৬+১-এর বদলে ৫+১ করলেন, এর যৌক্তিকতাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। মনে হয়, সরকার অনুচিত কাজ করলেন।

শিউলি মজুমদার

দুটি নাটক—প্রাসঙ্গিক-ভাবনা

অভিজিৎ করগুপ্ত

পশ্চিম বাঙলার জীবনমুখী এবং বস্তুনিষ্ঠ থিয়েটার আন্দোলন আজ এক চূড়ান্ত অভিমুখীনতায় আক্রান্ত। সুস্থ শিল্প, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বৈপ্লবিক চেতনার আদর্শে প্রাণিত কয়েক হাজার থিয়েটার গ্রুপ এবং তাদের তথাকথিত প্রগতিকামী (অথবা প্রগতিবিলাসী) নাট্যদর্শন আশির দশকের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত এবং হতশ্রী। অতীতের বলিষ্ঠ অঙ্গীকারের গ্রন্থি থেকে সে আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পথহারা শিশুর মতো এই নাট্য-আন্দোলন হাতড়ে চলেছে পরিত্রাণের উপায়।

অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে, তৎকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শতাব্দী-প্রাচীন জাঙ্কাকে প্রায় চ্যালেনজ জানিয়ে, বাঙলা থিয়েটারের জমিতে যে ভিন্নধর্মী নাট্যচর্চার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এক আশাদীপ্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সেই তাকে মৃতপ্রায় অস্তিত্বের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

কেন এমন হল? অনেকের মতেই এটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্থিতাবস্থার সাংস্কৃতিক প্রতিফলন। কেউ বলবেন, এ এক ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব। এঁরা মনে করেন, প্রতিভার অভাবই এই শূন্যতার একটি কারণ। আবার কারো কারো বিশ্বাস, এই স্থবিরতা, এই অনভিপ্রেত অবনতি, এই দৈন্যের মূল নিহিত আছে গণনাট্য আন্দোলনের ভাঙন এবং গণনাট্য ও নবনাট্য ধারার তত্ত্বগত তথা দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাতের মধ্যে। আমি বলব, পশ্চিমবঙ্গের জীবনমুখী নাট্য-আন্দোলনের এই ভগ্নদশার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সে নিজে—সবচেয়ে বড়ো কারণ এই আন্দোলন হারিয়ে ফেলেছে একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং ব্যাপক অর্থে সততা। এই ক্ষুদ্র ভূমিকার জন্যই আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে জেনেও বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, এ রাজ্যে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারাটাই আজ বিবর্ণ, শতচ্ছিন্ন আভরণের যন্ত্রতত্ত্ব থেকে প্রায়শই উঁকি মারে যশোলোভী এবং সুবিধাবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন কিছু ধূর্ত এবং কুটিল চোখ।

ব্যতিক্রম যে একেবারেই নেই তা নয়। এই কলকাতা শহরেও কিছু প্রযোজনা থেকে এখনো মাঝে-মাঝে বাস্তব চেতনার বিকিরণ দেখে ছুটে আসেন দর্শকরা। বক্তব্য, আঙ্গিক, উপস্থাপনা এবং সর্বোপরি সমাজ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব প্রযোজনার কয়েকটিকে আমরা উদ্‌ভাসিত হতে দেখি প্রকৃত জীবনচেতনায়। যতই ক্ষীণ এবং ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন এইসব বিচ্ছিন্ন প্রয়াস—তবুও তা স্বস্তির। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আজকের কোনো নাটকই হয়তো কালোত্তীর্ণ বিবেচিত হবে না; তথাপি এদের সমালোচনা করার সময় মনে রাখতে হবে—মৃতপ্রায় নাট্য-আন্দোলনের কাছ থেকে ঠিক এই মুহূর্তেই অসাধারণ প্রত্যাবর্তন আশা করা যায় না। কিন্তু সঠিক এবং বাস্তব-চিন্তাঋদ্ধ পরিকল্পনা এই হতমান নাট্য-আন্দোলনকে পুনশ্চলমান করতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের পথে। বহু মানুষের শ্রম, নিষ্ঠা, চিন্তা এবং সৃজনী শক্তির সুষম এবং সুস্থ সঙ্গমেই এই নবযাত্রার সূচনা হতে পারে।

নাটক

আমাদের এখন আলোচ্য দুটি সাম্প্রতিক রচনা। প্রথমটি থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বেলা অবেলার গল্প', এবং দ্বিতীয়টি বহুরূপীর 'মিস্টার কাকাতুয়া'। কলকাতা শহরের এই দুটি ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তারই আলোকে আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করব পশ্চিম-বাঙলার বর্তমান নাট্যভাবনাকে—অবশ্যই উত্তর কলকাতার ব্যবসায়িক থিয়েটার এ আলোচনার আওতার বাইরে। এ সম্পর্কে একটি সৎ স্বীকারোক্তির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। মাত্র দুটি নাটকের আলোচনার মধ্য দিয়ে গোটা আন্দোলন-এর গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করা যায় না—এই নিবন্ধকে তাই কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা মনে না করে একটি দীর্ঘ যাত্রার সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করাই সঙ্গত হবে।

বেলা অবেলার গল্প

আরনলড ওয়েসকার 'চিকেন সুপ উইথ বারলি' নাটকটি লিখেছিলেন একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য। লনডনের ঈসট এনড-এর ইহুদি পরিবার খানদের দীর্ঘ কুড়ি বছরের জীবনচর্চার পাশাপাশি এ নাটকে আমরা প্রত্যক্ষ

করি একটা সময়কে, কিছু মানুষের মতাদর্শের বিবর্তনকে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫—দুটি দশক ধরে একটি আন্দোলনকে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয় এই পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কারো স্থবিরতা, কারো আশা বা উৎসাহভঙ্গের হতাশা, আবার কারো বা অচল, অনড় বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ক্রমশ গড়িয়ে চলে সময়। শুধু এটুকু হলেই কোনো কথা ছিল না। কিন্তু 'চিকেন সুপ উইথ বারলি' পড়ার পর আরো একটি প্রশ্ন এসে ধাক্কা মারে সচেতন পাঠকের চেতনাকে। শুধুমাত্র একগুচ্ছ মানুষের মানসিকতা এবং রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তর বা মেটামরফসিস-ই কি এই নাটকের বিষয়বস্তু? অবশ্যই নয়, আরো গভীরে প্রোথিত আছে এর বক্তব্যের শিকড়। একটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিকশ্রেণী কিভাবে তাদের উদ্দেশ্যসচেতনতা হারিয়ে ফেলে ওয়েসকারের নাটক আপাতদৃষ্টিতে তারই দর্পণ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে; মনে হতে পারে কিভাবে ব্যক্তিমানুষ বৃহত্তর সমাজচেতনার গালভরা অঙ্গীকারের পেছনে লুকিয়ে রাখে তার একান্ত প্রিয় নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনার বীজকে, নাট্যকার শুধুমাত্র তারই ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এ সবই অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন। এই নাটকে অতি সূক্ষ্মরূপে ওয়েসকার চালেনজ ছুঁড়েছেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতার প্রতি। অসম্ভব দক্ষ লেখনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়েও নাট্যকারের এই সুপ্ত অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, "বেলা অবেলার গল্প"-র নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির নাট্যরূপ দিতে গিয়ে ওয়েসকারের এই বিশেষ নাটকটির দিকেই বা হাত বাড়ালেন কেন?

তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটকে বিধৃত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ কুড়ি বছরের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে প্রত্যয় এবং অবক্ষয়ের এক নিরাভরণ রূপ। মূল নাটকের সারা চরিত্রের আদলে অশোকবাবু এখানে এনেছেন স্মৃতিকে। হতাশার তীব্র অন্ধকার ভেদ করে যে শুধু নিজেকেই নয়, চারপাশের অন্য মানুষদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তার অফুরন্ত উদ্দীপনা প্রায় আবিষ্ট করে রাখে প্রেক্ষাগৃহকে। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তো শুধুমাত্র আবেগতাড়িত হতে পারে না। স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কারণেই এক ধরনের অস্বস্তিতে জর্জরিত হতে হয়; অনিবার্যভাবেই মনে হতে থাকে—সুপার-অপটিমিজম আর সায়ানস কখনোই এক জিনিস হতে পারে না। অশোকবাবুর "বেলা অবেলার গল্প" এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকেই এক দুর্বোধ্য কারণে পাশ কাটিয়ে যায়—ওয়েসকারের নাটকেও একই জিনিস দেখেছি। স্মৃতি চরিত্রে মায়া ঘোষের দুরন্ত অভিনয় নাটকে বহু দুর্বলতাকেই আড়াল করে রাখে, একই সঙ্গে ম্লান করে দেয় অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য উপাদানকেও। শোভা, ইতু এবং বাসন্তীর চরিত্রে পাপড়ি বসু, ওয়াহীদা মল্লিক ও জবা সরকার সম্পূর্ণভাবেই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন অভিনেত্রীর স্তরে রয়ে যান। স্মৃতির স্বামী হারাধন। শ্রমবিমুখ এই চরিত্রটি রাম মুখোপাধ্যায় বেশ সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্যরা আক্ষরিক অর্থেই গতানুগতিক। "বেলা অবেলার গল্প"-এর কিছু ব্যাপার বেশ পীড়াদায়ক। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উত্থান-পতন এবং ভাঙা-গড়ার প্রতি অতিমাত্রায় সহনশীল স্মৃতি তার স্বামী এবং শাশুড়ির প্রতি বিরূপতাকে অত উদগ্রভাবে প্রকাশ করে কেন? মূল্যবোধের কেন এই অসম সহাবস্থান? এটা বাস্তব হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই কাম্য নয়। বোঝা গেল না কেন অশোকবাবু চরিত্রটিকে ওয়েসকারের সারা চরিত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করলেন না? অপর একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির ছেলে রুনু (এখন সে যুবক) পিসি শোভার জন্য চা বানাতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে—হঠাৎই গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে, "Down the way where the nights are gay/ And the Sun shines gayly on the mountain tops/…সঙ্গে নাচের ভঙ্গিমা। অবাক হতে হয়, এরকম একটা সীরিয়াস নাটকে এ ধরনের ভ্রান্তি দেখে। ষাটের দশকের মধ্যলগ্নে বেলগাছিয়ার বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দা এক দরিদ্র, সংগ্রামী যুবক যে কায়দায় ওই ইংরেজি গানের কলি উচ্চারণ করেন তা দেখে এই আশির দশকের কোনো অত্যাধুনিক জাভেরিয়ানও লজ্জা পেতে পারে। এসব কেন হয়? কেন আসে? এসবের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? কে জানে! নাট্যকার-পরিচালকের বিভিন্ন রকম মূল্যবোধের বৈপরীত্যজনিত দ্বন্দ্বই কি এজন্য দায়ী? প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম এই কারণে যে শুধু নাটক নয়, এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজচেতনা, ধর্ম—প্রতিটিক্ষেত্রেই আজ বিপরীতধর্মী বিভিন্ন মূল্যবোধ এক অশুভ সমান্তরাল গতিতে প্রবহমান। প্রগতিশীল শিল্পসংস্কৃতিই দায়িত্ব ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে মানুষের সংগ্রামী মূল্যবোধকে উজ্জীন করে তোলা। অথচ দুঃখের বিষয় সে নিজেও আজ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।

মঞ্চসজ্জা এবং সংগীত এ নাটকের ক্ষেত্রে সম্পদ হয়ে ওঠে নি। "বেলা অবেলার গল্প"র মঞ্চ অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন, কিন্তু কোনোমতেই বাস্তবানুগ নয়। পঞ্চাশের দশকের কলকাতা শহরের এক নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহসজ্জায় কী করে অত সচ্ছলতার ছাপ থাকে? কোনোরকম প্রতীকী তাৎপর্যও আবিষ্কার করা গেল না। শক্তি সেনের রূপসজ্জা এবং তাপস সেনের আলো ভালো।

প্রথাগত বিশ্লেষণের পর এবার তাকানো যাক প্রযোজনার সামগ্রিক চেহারার দিকে। "বেলা অবেলার গল্প" নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস—যদিও এর সর্বাঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এক ধরনের ব্যবসায়িক মনোভাব; দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ শ্রেণী-অবস্থানও চোখ এড়ায় না। সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও থিয়েটার ওয়ার্কশপের এই নাটক আমাদের ভাবায়, বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে। নাট্যকার-পরিচালক অশোক মুখোপাধ্যায় এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই—বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটকে আর-একটু মাটির কাছে আনলে, আর-একটু বাস্তবঘেঁষা হলে "বেলা অবেলার গল্প"-র আবেদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। 'অগণন মানুষের ভিড় থেকে বেছে নেওয়া একমুঠো' মানুষ তা হলে সত্যি-সত্যিই এক সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতার জীবন্ত দলিল হয়ে উঠত।

মিস্টার কাকাতুয়া

এক কথায় একটি উপভোগ্য নাটক—'ব্যতিক্রমী' কিনা সে প্রসঙ্গের আলোচনায় পরে গেলেও চলবে। প্রথমেই তাকানো যাক কাহিনীবিন্যাসের দিকে। মানিকলাল এক ধনী শিল্পপতির একমাত্র পুত্র। লনডন স্কুল অব ইকনমিক্স্-এর ছাত্র মানিকলাল অসম্ভব মেধা আর প্রজ্ঞার অধিকারী। ফেরার পর মার ইচ্ছায় তাকে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই সময়ই সহসা তার জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে যায়। মানিকলাল সন্ধান পায় তার ছেলেবেলায় হারিয়ে-যাওয়া কাকাতুয়া তুতুর। তারপর থেকে তুতু ওর নিত্য সহচর। এখন তার নাম অরিন্দম। বলা বাহুল্য, অরিন্দমের কোনো শরীরী অস্তিত্ব নেই। শুধু মানিকের চোখেই এই সাড়ে তিন ফুটি কাকাতুয়াটি অতি বাস্তব। আর সকলের দৃষ্টিতে এই কল্পিত কাকাতুয়াটি মানিকের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা ওকে উন্মাদ ভাবে। আপাতদৃষ্টিতে সেটাই স্বাভাবিক, কেননা এই অদৃশ্য পাখিটির সঙ্গে মানিক সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। তার জন্য টুপি, মাফলার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বসবার জন্য এগিয়ে দেয় চেয়ার। অরিন্দমকে নিয়ে মানিকলালের এই আচরণকে ওর প্রিয়জনেরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না। তারা তাকে চিকিৎসার জন্য মানসিক নারসিংহোমে নিয়ে যায়। অথচ নাটকের শেষ লগ্নে আমরা দেখি, মানিকের বর্তমান আচরণকে মেনে নিয়েই এরা আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানিক বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, মানিক সত্যবাদী, মানিক মদ খেয়েও মাতাল হয় না, সবচেয়ে বড়ো কথা—মানিক তার টাকাপয়সা সম্পর্কে ভীষণভাবে অসচেতন। মানিকের ছোটোবৌদি বীণাপাণি মনোরোগচিকিৎসক ড. পাকড়াশীর কাছে এসেছিল মানিককে নারসিংহোমে আটকে রাখবার জন্য। ড. পাকড়াশী এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে মানিকলালের উপর প্রয়োগ করতে চান এক বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতি। ট্যাকসি-ড্রাইভারের মুখে বীণাপাণিরা জানতে পারেন, এই চিকিৎসার ফলে মানিক 'সুস্থ' হলেও হারিয়ে ফেলতে পারে তার যাবতীয় ঔদার্য। সহসা চমক ভাঙে বীণাপাণির এবং আরো অনেকের। এক ঝটকায় মানিককে-ঘিরে-থাকা এই তথাকথিত সুস্থ মানুষগুলির লোভ এবং হীনতা আভরণহীন হয়ে পড়ে। আমরা দেখতে পাই কিভাবে পেঁয়াজের পরতের মতো এদের অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে কিছু অসুস্থ মূল্যবোধ। মানিক সুস্থ হলে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আছে—এই আশঙ্কায় এরা চকিতে খোলস বদলে নেয়। মানিককে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নাটকের শুরুতে যে প্রশ্নকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহের দিকে, তারই অনুরণণে স্পন্দিত হতে থাকে দর্শকের মন—কে সুস্থ? কে অসুস্থ? জানা নেই। আমরা যে সবাই উন্মাদ, সবাই। কোথায় ওষধি? কোথা তার অস্তিত্ব? এ আরোগ্য-নিলয়?

কুমার রায়ের পরিচালনা এবং মানিকলাল চরিত্রে গৌতম বসুর অসাধারণ অভিনয় এ নাটকের দুটি অনন্য সম্পদ। আবহসংগীত এবং আলো তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। রূপকার শক্তি সেন যথাযথভাবে পালন করেছেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। মোট তেরোটি চরিত্রের মধ্যে মানিক-

লালকে বাদ দিলে অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে রামশঙ্কর রায়ের চরিত্রে তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং বীণার চরিত্রে দীপা দাশগুপ্তর নাম। বাকি সবাই বহুরূপীর মানকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন—এর থেকে বেশি কিছু নয়। বীণাপাণিকে স্রেশ্‌ট এবং স্রেশ্‌ট উচ্চারণের পার্থক্য বোঝাবার সময় বীণা দাশগুপ্তর আচরণকে অভিনয় বলে মনেই হয় না। মিস্টার কাকাতুয়ায় ব্যবহৃত দুটি সেট-এর প্রথমটি মানিকলালের বাড়ি এবং দ্বিতীয়টি ড. পাকড়াশীর নারসিংহোমের অফিস-ঘর। নিঃসন্দেহে দুটি সেটই বাস্তবসম্মত কিন্তু কোনোটিই অসাধারণ নয়।

বহুরূপী তাঁদের এই নতুন প্রযোজনাকে চিহ্নিত করেছেন 'ব্যতিক্রমী' হিসেবে। অনেকেই এ ব্যাপারটা মানতে নারাজ। বহুরূপীর একটা দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী অতীত রয়েছে—যার প্রতিটি অধ্যায় বৈচিত্র্য আর নতুনত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। 'অন্ধদিউপাস' থেকে 'পুতুলখেলা' অথবা 'মৃচ্ছকটিক' থেকে 'মালিনী' সর্বত্র এবং সর্বদাই এই বৈচিত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত। তবুও বহুরূপীর বর্তমান কর্ণধাররা মিস্টার কাকাতুয়াকে কেন ব্যতিক্রমী বলছেন বুঝি না।

এবার নাটকের বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ। মিস্টার কাকাতুয়ার বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের পরিধি বিশেষ বিস্তৃত নয়। মানুষের দ্বিতীয় সত্তার আভরণ উন্মোচন এবং বহিরাঙ্গিক সুস্থতার ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে এখানে আনা হয়েছে মানিকলাল এবং তার কল্পিত কাকাতুয়া অরিন্দমকে। এই দুজনের মিলিত অস্তিত্ব ধীরে-ধীরে এক দর্পণের রূপ পরিগ্রহণ করে। মানিকলাল চরিত্রটির সঙ্গে—ওর প্রথাবিরোধী আচরণের সঙ্গে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমরা মুখোমুখি হই নিজেদের অন্তর্গত সত্তার। ট্রীটমেনটের গুণে পুরো ব্যাপারটাই উপস্থাপিত হয়েছে একটা নিটোল হাস্য-রসের মেজাজ নিয়ে। এই কারণেই মিস্টার কাকাতুয়া দেখতে ভালো লাগে।

"বেলা অবেলার গল্প" নাটকে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কমিউনিসট আন্দোলনের বহমনতাকে বিশ্লেষণ করার জন্য অশোক মুখোপাধ্যায় সাহায্য নিচ্ছেন ওয়েস্‌কারের; আর "মিস্টার কাকাতুয়া"য় এসে দেখছি, মানুষের প্রকৃতি, দ্বিতীয় সত্তা এবং সুস্থতা-অসুস্থতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে নাট্যকার প্রশান্ত দেব হাত বাড়িয়েছেন অন্য একটি বিদেশী নাটকের দিকে। রূপান্তর বাঙলা নাট্যজগতে কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন জাগে, এই দুটি বিষয় নিয়ে মৌলিক নাট্য রচনা কি একেবারেই দুঃসাধ্য ছিল?

আলোচনার শেষ লগ্নে এসে হঠাৎই কুমার রায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি মনে পড়ল। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে কুমার রায় লিখছেন: "বহুরূপী ভাল করল কি মন্দ করল তার ঊর্ধ্বে ইতিহাসের কাছে একটা দায় থেকে যায়।" "বেলা অবেলার গল্পে" সেই দায়বোধ কিঞ্চিৎ উঁকি মেরে গেলেও স্বয়ং কুমার রায়-পরিচালিত "মিস্টার কাকাতুয়া"-তেই তা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত।

IN-LAWS OR OUTLAWS

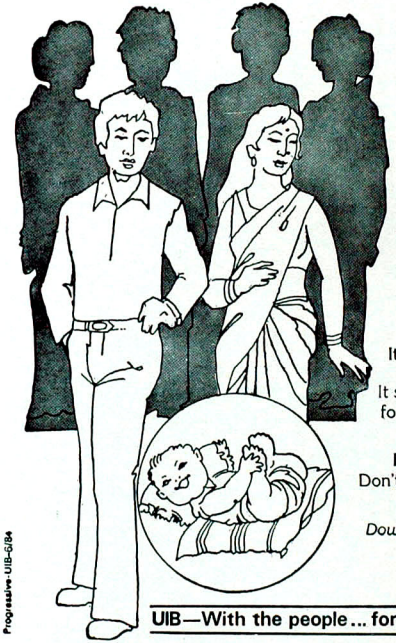

There Is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come.

Help eradicate dowry.
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

Remember, Dowry is prohibited by law.

Progressive-UIB-6/84

UIB—With the people... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001